



মোবাইল: নং -০১৭১৩৭৪১৬৮৬
ই-মেইল -debesh00007@gmail.com

এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ স্মৃতি

-দেবেশ চন্দ্র সান্যাল

উনিশ শ' একাত্তর সাল। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন পাকিস্তানে সামরিক শাসন চলছিল। সামরিক শাসনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তখন পাকিস্তানের সাধারণ পরিষদের সংরক্ষিত আসন সহ মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩১৩টি। এই সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানের ৩১৩ টি আসনের ১৬৭ টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ। ১৬৭টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক আওয়ামী লীগ কে সরকার গঠনের আহ্বান জানালো না। আন্দোলন সংগ্রামের এক পর্যায়ে ৭ মার্চ ৭১ আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বক্তব্যের এক পর্যায়ে বললেন-... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...।” ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১১ টার পর পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এর নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান এর নেতৃত্বে জ্বালাও পোড়াও সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ শুরু করে। পাকিস্তানি সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের কারণে বাঙালি সৈন্য, ই.পি. আর, পুলিশ, আনসার ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের দ্বারা দেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলো। রাত সাড়ে এগারটার পর থেকে প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে করতেই এলো ২৬ মার্চ। ২৬ মার্চ ৭১ থেকে শুরু হলো মহান স্বাধীনতা/মুক্তিযুদ্ধ। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা/মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল জন্য আমাদের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২৬ শে মার্চ। আমি তখন রতন কান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ২৫ মার্চ ৭১ কাল রাত থেকে শুরু হলো পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতা। পাকিস্তানি হানাদারেরা বিশ্বের জঘন্যতম এই নৃশংসতার নাম দিল “অপারেশন সার্চলাইট”। ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর চালালো বিনা বিচারে জ্বালাও, পোড়াও, নির্যাতন, হত্যা ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী কাজ। ২৫ মার্চ ৭১ এর পর আস্তে আস্তে পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা সারা দেশের অধিকাংশ জায়গায় ক্যাম্প করলো। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে হেরে যাওয়া জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতা কর্মীরা পাকিস্তানের পক্ষ নিল। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের সহযোগিতার জন্য তাঁরা পীচ কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও অন্যান্য বাহিনী গড়ে তুললো। এ দেশের অধিকাংশ বিহারী অধিবাসিরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পক্ষ নিল। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা পশ্চিম পাকিস্তানি থেকে কিছু বিহারী যুবকদের পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের শায়েস্তা করতে হবে বলে সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দিয়ে মিলেশিয়া হিসেবে রিক্রুট করে এদেশে নিয়ে এসে ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা সারা দেশে ধর পাকড় করতো। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের এদেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় সারা দেশ ব্যাপী জ্বালাও, পোড়াও, হত্যা, গন হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ, জোর করে ধর্মান্তর করণ ও চাঁদা বাজি সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কাজ করতে থাকলো। ৭ মার্চ ৭১ এর পর থেকে পাকিস্তানি বিহারী সৈন্যরা তাদের সাথে চাকরি করা বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্র করতে থাকলো। কিছু বাঙালি সৈন্য অস্ত্র নিয়ে অথবা খালি হাতে পালিয়ে এলেন। হানাদারেরা তাদেরই সাথী কিছু বাঙালি সৈনিক কে হত্যা করে ছিল। পীচ কমিটির লোক, রাজাকারেরা ও অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধীরা

পাকিস্তানি সৈন্যদের আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুদের বাড়িঘর চিনিয়ে দিত। পাকিস্তানি সৈন্যদের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে গ্রামে যেতো। তারা চিনিয়ে দিত কোন বাড়ির লোক মুক্তিযুদ্ধে গেছে। তারা পাকি হানাদারদের তথ্যদিত, বাড়িঘর লুটতরাজ, আগুন দিত ও চাদাঁ বাজি করতো। তাদের এই নিষ্ঠুরতা দেখে জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। প্রতিদিন পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতার কথা জানতাম বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী মানুষদের কাছ থেকে। তখন স্কুল কলেজ সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ঢাকা সহ অন্যান্য শহরে চাকরি করা আমাদের এলাকার অধিকাংশ চাকুরী জীবী ও অন্যান্যরা জীবন বাঁচাতে বাড়িতে বাড়িতে এসে অবস্থান নিলেন। তাঁদের কাছ থেকে ও অন্যান্যের কাছ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস ভয়াবহতার কথা জানতে পারলাম। পাকিস্তানি সৈন্যরা আরিচা-নগর বাড়ি ফেরিঘাট পাড় হয়ে যাতে উত্তর বঙ্গে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য পাবনা শহরের ও অন্যান্য আশে পাশের থানা ও গ্রামের স্বাধীনতা কামীরা নগর বাড়ি ঘাটে বাংকার করে অবস্থান নিল। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের বোম্বিং- এ নগর বাড়ি ঘাটের স্বাধীনতা কামী মুক্তিযোদ্ধারা পজিশন ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তাঁরা পিছিয়ে এসে পাইকর হাটি (ডাব বাগানে বর্তমানে শহীদ নগর) এসে বাংকার করে অবস্থান নিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা আরিচা ঘাট থেকে ফেরী নিয়ে নগর বাড়ি ঘাটে নেমে উত্তর বঙ্গের পাবনা বগুড়া ও অন্যান্য শহর দখলের জন্য মার্চ করলো। ১৯ এপ্রিল'৭১ ডাব বাগানে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন ই.পি. আর সুবেদার কুমিল্লার সন্তান আলী আকবর। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের ভারী অস্ত্রের কাছে মুক্তিযোদ্ধারা কুলিয়ে উঠতে পারলেন না। এই যুদ্ধে বেশ কয়েক জন মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হলেন। স্বাধীনতা কামীদের সহযোগিতা করার জন্য বেড়া, সাঁথিয়া, শাহজাদপুর ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী থানার অনেকেই শুকনা খাবার এনে স্বাধীনতা কামীদের দিয়ে ছিলেন। আমি ও আমার গ্রামের মো: আবুল কালাম সরকার ও অন্যান্যরা আমাদের গ্রামের মানুষদের দেওয়া সিদ্ধ ডিম, চিরা, মুরি নিয়ে ডাব বাগান গিয়ে ছিলাম। ডাব বাগান যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে হেরে গিয়ে বিভিন্ন যায়গা আত্ম গোপন করলেন। আমি আর কালাম ডাব বাগান থেকে হেঁটে বেড়ার মধ্য দিয়ে বাড়িতে চলে এলাম। সিরাজগঞ্জ জেলার স্বাধীনতা কামীরা বাঘাবাড়ী ঘাট উত্তর পারে বাংকার করে প্রতিরোধ যুদ্ধ করার জন্য অবস্থান নিলো। ২৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঘাবাড়ী ঘাটের দক্ষিণ পারে এসে দুইটি শক্তিশালি মর্টার বা কামানের গুলি ছাড়লো। কামানের বা মর্টারের এই গুলির একটি গিয়ে পড়লো ডায়া নামক গ্রামে। এই গুলিতে ডায়া গ্রামের একটি গরুর ক্ষতি হয়েছিল। আর একটি গুলি গিয়ে পড়েছিল নড়িনা নামক গ্রামের কাছে। তখন বাঘাবাড়ী বড়াল নদীতে ব্রিজ ছিল না। পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্য সিরাজগঞ্জ জেলার স্বাধীনতা কামী বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, আনসার, আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা বাঘাবাড়ী ঘাটের উত্তর পারে বাংকার করে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। সিরাজগঞ্জ তখন পাবনা জেলার একটি মহকুমা ছিল। মহকুমা প্রশাসক জনাব এ.কে. শামস উদ্দিন স্বাধীনতা কামীদের নেতৃত্বে ছিলেন। ২৪ এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যদের মর্টারের বা কামানের গুলিতে এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি হলো। বাঘাবাড়ী ঘাটের উত্তর পারে বাংকারে পজিশন গ্রহন কারী প্রতিরোধ কারীরা বাংকার ছেড়ে গ্রামের মধ্যে আত্মগোপন করলো। ২৫ এপ্রিল সকালে ফেরিতে পাকিস্তানি সৈন্যরা নদীর উত্তর পারে এলো। অন্যদিক থেকে ঈশ্বরদি হয়ে ট্রেন যোগে উল্লাপাড়া স্টেশনে নেমে কিছু সৈন্য এলো। বগুড়া আর্মি ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিছু সৈন্য বাঘাবাড়ী ঘাটের দিকে মার্চ করলো। ২৫ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী কামান দাগাতে দাগাতে ও রাস্তার দুই পাশের বিভিন্ন বাড়ি ও দোকানে আগুন দিতে দিতে চান্দাই কোনা পর্যন্ত গেল। ঐ দিন চরিয়া নামক গ্রামে গণ হত্যা করলো। এই গণ হত্যায় নিহত হিন্দু, মুসলমান নারী-পুরুষ দের ১২৯ জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। দুপুরের পর চান্দাই কোনা থেকে ফিরে এসে শাহজাদপুর সদরের আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুদের বিভিন্ন বাড়ি ঘর ও দোকান সমূহে আগুন দিয়ে পোড়ালো। সবাই কে নির্দেশ দিল- আপনারা হিন্দুদের বাড়িঘর ও দোকানের মালামাল সহ সব লুটতরাজ করে নিয়ে যান। পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্দেশ পেয়ে শাহজাদপুর

থানার বিভিন্ন গ্রামের স্বাধীনতা বিরোধী ও খারাপ যুবকেরা শাহজাদপুর, দ্বারিয়াপুর বাজার, মনিরাম পুর বাজার ও অন্যান্য স্থানে অবস্থিত বিনোদ বিহারী জোয়ার্দার, গৌড়কুণ্ড, প্রাণ গোপাল সাহা ও অন্যান্য হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুটতরাজ করে নিয়ে গেল। পোঁতাজিয়া গ্রামের অধিবাসি আমাদের রতন কান্দি গ্রামের জামতা মো: মাহতাব আলী সরকার ও অন্যান্যরা হিন্দুদের দোকান ও বাড়ি ঘরের মালামাল লুটতরাজ করে নিয়ে এলো। কেহ আনলো জিরার বস্তা, কেহ আনলো চাউল ও অন্যান্যরা যে যা পারলো লুটতরাজ করে নিয়ে এলো। করতোয়া নদীর পূর্ব পাড়ে আমি ও আরো অনেকে দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখলাম। কিছুই করার ছিল না। সারাদেশ ও শাহজাদপুরে পাকিস্তানি আর্মিদের ভয়াবহ নির্যাতন ও জ্বালাও পোড়াও দেখে শাহজাদপুরের আওয়ামী লীগ, হিন্দু ও অন্যান্যদের সম্ভবত রক্ষা করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এলেন শাহজাদপুরের মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়া খান মজলিশ স্যার। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা ২৫এপ্রিল'৭১ উল্লাপাড়া থানার চড়িয়া নামক গ্রামে গণহত্যা করলো। এই গণ হত্যায় নিহত ১২৯ জনের হিন্দু মুসলমান নারী-পুরুষদের পরিচয় পাওয়া গেছে। কিছু দিন পর উল্লাপাড়ার এক স্বাধীনতা বিরোধীর ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানি সৈন্যরা কান সোনা ঘোষ পাড়া গণ হত্যা করলো। কান সোনা গ্রামের এই গণহত্যায় ৭ জন নারী পুরুষ কে নির্যাতন ও হত্যা করেছে। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যরা এই গণ হত্যায় যাদের কে হত্যা করেছে তাঁরা হলেন- ভোলা, সুশীল, রবীন্দ্র, ভবেশ, রমেন্দ্র, সুরোজ বালা ও বাসন্তী ঘোষ। ঐ দিন কান সোনা গ্রামের ঘোষ পাড়ার কয়েকটি বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ করেছিল। সারাদেশে অধিকাংশ পীচ কমিটির লোকজন স্বাধীনতা বিরোধীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের বাঙালিদের বিভিন্ন ভাবে নির্যাতনে সহযোগিতা করেছে। আমাদের শাহজাদপুর থানা পীচ কমিটির প্রধান ছিলেন মাওলানা সাইফুদ্দিন এহিয়া খান মজলিশ। তিনি ছিলেন পীর বংশের মানুষ। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি শাহজাদপুরে কয়েকটি হাসপাতাল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা ও সমাজসেবা মূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ প্রার্থী মো: আব্দুর রহমানের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তখন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের ২৩ বছরধিক সময়ের বঞ্চনা, জুলুম ও অত্যাচারের জবাব দেওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন। যে কারণে মাওলানা সাহেব অত্যন্ত ভালো মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত হতে পেরে ছিলেন না। ২৫ এপ্রিল শাহজাদপুরে পাকিস্তানি সৈন্যদের নেতৃত্বে জ্বালাও পোড়াও ও লুটতরাজ সহ বিভিন্ন মানবতা বিরোধী কার্যক্রম চলছিল। আমাদের ধারণা ইহাতে মাওলানা সাহেব ভীষণ ব্যথিত হয়ে পড়েন। তিনি পাকিস্তানি অবাঙালি মেজরের সাথে যোগাযোগ করেন এবং শাহজাদপুরের আওয়ামী লীগ, হিন্দু ও অন্যান্যদের রক্ষার জন্য কৌশল করে তাঁদের সাথে যোগদেন। তিনি উর্দুভাষা ভালো বলতে জানতেন। তিনি তাঁর সাধ্যানুসারে বিভিন্ন ভাবে শাহজাদপুর বাসীকে রক্ষা করেছেন। তিনি বিহারী মেজরের সাথে যোগাযোগ না রাখলে শাহজাদপুর থানায় হয়তো বা আরো বেশী ক্ষতি হতো। পাকিস্তানি সৈন্যরা যুবকদের প্যান্ট বা লুঙ্গি খুলে লিঙ্গ দেখে হিন্দু মুসলমান নির্ধারণ করতো। কোন হিন্দু যুবক পাকিস্তানিদের কাছে হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হলে মাওলানা সাহেব উর্দুতে তাদেরকে বুঝাতেন 'মেথর হ্যায়'। মেথর মল, মুত্র ও অন্যান্য অপরিষ্কার পরিষ্কার করে এই কথা বলে উর্দুতে সৈন্যদের বুঝাতেন। এই কথা বলে হিন্দুদের ছেড়ে দেওয়াতেন। জুলাই'৭১ মাসের প্রথম দিকে একদিন আমাদের গ্রামের মো: নজরুল ইসলাম শাহজাদপুরের অবস্থা দেখার জন্য শাহজাদপুরে গেলেন। তিনি পাকিস্তানি আর্মিদের হাতে ধরা পড়ে ছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে সহ ১০/১২ জন যুবক কে সকাল ১০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ পর্যন্ত আটকিয়ে রেখেছিলেন। সংবাদ পেয়ে সন্ধ্যা ৭ টার পর মাওলানা সাহেব এসে মেজরকে বুঝিয়ে সবাই কে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। মো: নজরুল ইসলাম ভাই পরে এক দিন তার পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়া ও ছেড়ে আসা সম্পর্কে বললেন- পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের সকল যুবকের পরনের কাপড় খুলে লিঙ্গ

দেখে হিন্দু মুসলমান নির্ধারণ করলেন। আমাদের অধিকাংশ কে বললেন- “কাপড়া তোল”, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন-‘তুম মুসলিম হ্যায়’, “চার কলেমা বাতাও”। ‘মালাউন কাহা হ্যায়’ ‘মুক্তি কাহা হ্যায়। মুক্তি কে ধার মে আয়া, কে ধার মে যায়...’। মাওলানা সাহেব পাকিস্তানি সৈন্যদের বুঝিয়ে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে বাঘা বাড়ি ক্যাম্পের পাকিস্তানি সৈন্যরা পোঁতাজিয়া গ্রামে ঢুকে লুটপাট, নারী নির্যাতন ও অগ্নি সংযোগ করে ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঘা বাড়ি ক্যাম্প থেকে প্রথমে মাদলা নামক গ্রামে আসে। গ্রামের লোক জন পালাতে থাকে। মাদলা গ্রামের অবস্থা দেখে ও শুনে পোঁতাজিয়া গ্রামের লোকজনও পালাতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা মাঠ দিয়ে দৌড়ে এসে অধিকাংশ কে আটকিয়ে পোঁতাজিয়া কালি বাড়ির কাছে দার করায়। এই গ্রামে তারা পাবনা থেকে এসে এই গ্রামে আশ্রয় নেওয়া হাসি ও রোজিকে নির্যাতন করে। এর পর এই গ্রামের পূর্ণ নামের সদ্য প্রসূতি এক গৃহবধুকে নির্যাতন করে। ঘোষ পাড়ার মেয়ে বুলবুলিকে খোঁজার জন্য তারা সারা গ্রাম তছনছ করে। মে মাসের প্রথম দিকে পাক সেনারা বৃআঙ্গারু গ্রামে গিয়ে আব্দুল বারি আজাদ (মজনু) মেম্বারের বাড়িতে প্রথমে আক্রমণ করে। তাদের কাছে খবর ছিল আওয়ামী লীগ এমএনএ সৈয়দ হোসেন মনসুর তারা মিয়া সেখানে আছেন। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁকে না পেয়ে পার্শ্ববর্তী ফকির চাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। ৮ মে পাবনা জেলার সাথিয়া থানার করঞ্জা নামক গ্রামের ম্যাঘা ঠাকুর বাড়িতে হানা দিয়ে লুটতরাজ ও প্রেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিল। ম্যাঘা ঠাকুর বাড়ির ৩ জন সহ ঐ গ্রামের ৮ জন মানুষকে অমানবীয় নির্যাতন করে হত্যা করলো। ১৪ মে ডেমড়া, বাউস গাড়ি, রূপসী গণ হত্যা হলো। তখন ডেমড়া, বাউস গাড়ী ও রূপসী দুর্গোম পল্লী এলাকা। নদী পথ ছাড়া পাকিস্তানি সৈন্যদের ঐ এলাকায় যাওয়া সম্ভব ছিলনা। যে কারণে শাহজাদপুর, বেড়া, নগর বাড়ী, বামুন গ্রাম, কুচিয়া মারা সহ বিভিন্ন এলাকার ধনাঢ্য হিন্দুরা স্বর্ণালঙ্কারাদি সহ বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস নিয়ে ডেমড়ায় আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ছিল। আসাদ নামক এক স্বাধীনতা বিরোধীর নেতৃত্বে কয়েক জন স্বাধীনতা বিরোধী ১৩ এপ্রিল’৭১ রাতে বেড়া থানা পাকিস্তানি ক্যাম্প থেকে লঞ্চে পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে এসে ছিল। ১৪ এপ্রিল’৭১ পাবনা জেলার ফরিদপুর থানা ডেমড়া ও সাঁথিয়া থানার বাউস গাড়ী ও রূপসী গ্রামের গণ হত্যা করে ছিল। ডেমড়া-বাউসগাড়ী রূপসী গণ হত্যায় আমার ৭ জন আত্মীয় প্রাণ হারালেন। তাঁরা হলেন - ১.প্রবোধ কুমার মজুমদার (মোনা মজুমদার)২. তাঁর ভায়রা ভাই বামুন গ্রামের লালু চক্রবর্তী। এই দুই জনই ছিলেন আমাদের বংশের জামাই। আমার পিতৃদেব এর আপন পিসে মহাশয়। আমাদের দাদু। ৩. রাম জগন্নাথ রায়, ৪. বলরাম রায়, ৫. দিলীপ কুমার রায়, ৬. নির্মলেন্দু রায়, ৭. অমলেন্দ্র নাথ রায় এই গণহত্যায় আমার এই ৭জন আত্মীয় সহ চার শতাধিক হিন্দু, মুসলমান নারী পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছিল। ১৮ মে সিরাজগঞ্জ জেলার কামার খন্দ থানার শিয়াল কোল নামক গ্রামে গণহত্যা হলো। এই গণহত্যায় সিরাজগঞ্জের জ্ঞানদায়িনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক যোগেন্দ্র নারায়ন বসাক, ২. তাঁর দাদা (বড় ভাই) ননী গোপাল বসাক, ৩. ভাতিজা প্রনব কুমার বসাক, ৪. শিব চরণ রবিদাস, ৫. গুরু চরণ রবিদাস, ৬. ফনীন্দ্র নাথ রবি দাস ও ৭. প্রেম নাথ দাস কে নির্মম ভাবে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করলো। দেশের ভয়াবহ অবস্থা। পাকিস্তানি সৈন্যরা স্বাধীনতা বিরোধীদের চেনানো পথ ধরে এসে এক এক রাতে এক এক গ্রাম ঘিরে রেখে ভোর থেকে গণ হত্যা চালায়। এদেশীয় স্বাধীনতা বিরোধী সহযোগীদের দিয়ে লুটতরাজ চালায়। বাড়িঘর ও দোকানে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেয়। ২৫ মার্চ কাল রাতের অপারেশন সার্চ লাইট এর পর থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও হিন্দুরা অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। বাঙালি সৈনিক, ই.পি.আর, আনসার ও অন্যান্য প্রশিক্ষিত বাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এদেশের অধিকাংশ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য নারী-পুরুষ। পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাঙালিদের কুলিয়ে উঠা সম্ভব হচ্ছিল না। প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য বাঙালি সৈন্য ও অন্যান্যরা ভারতে আশ্রয় নেয়। আমাদের গ্রামে করতোয়া নদী পাড় হয়ে আসতে হবে।

নৌপথ ছাড়া গ্রামে তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা আসতে পারবেনা। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা খুব ভালো। আমাদের গ্রামের সর্বজনাব ডা. মো: জয়নুল আবেদিন সরকার (জতু ডাক্তার), ভাইস প্রিন্সিপাল মো: নুরুল হক সরকার, কেমিষ্ট মো: নজরুল ইসলাম সরকার, ডা.মো: খলিলুর রহমান, মো: আব্দুল সরকার, মৌলভী মোহাম্মদ হোসাইন, মো: শাহ আলম মাস্টার, মো: আব্দুল মজিদ সরকার, মো: আবুল কালাম, মো: আকবর আলী মোল্লা, মো: ইউনুস মাস্টার, মো: আকবর আলী প্রামানিক সহ গ্রামের নেতৃস্থানীয় মুসলমান গণ মুসলমান যুবক ও সম্ভাব্য অন্যান্যদের ডেকে বললেন- “সারা দেশের ভয়াবহ অবস্থার কথা আপনারা সবাই জানেন। সারা দেশের যেখানে যাই হোক সবাই দেখবেন, আমাদের গ্রামের হিন্দুদের যেন কোন প্রকার ক্ষতি না হয়। হিন্দুরা আমাদের আমানত...। আমরা আমাদের গ্রামের হিন্দুদের রক্ষার জন্য সর্বাত্মক সতর্ক থাকবো”। আমাদের গ্রামের একজন মানুষও পীচ কমিটির সদস্য, রাজাকার ও স্বাধীনতা বিরোধী হয় নাই। সব মুসলমানেরা হিন্দুদের বিভিন্ন নিরাপত্তা দিয়ে ছিলেন। আদি কাল থেকে হিন্দু- মুসলমানেরা এ গ্রামে মিলে মিশে বসবাস করে থাকেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা উপস্থিত হলে মুসলমান গণ হিন্দুদের বিভিন্ন ভাবে নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন। আমাদের গ্রাম টি বিশ্বের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি অনন্য গ্রাম। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে গ্রামের অধিকাংশ হিন্দুরা পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়ে তাঁদের স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী প্রতিবেশী মুসলমানদের বাড়িতে রেখে এসে ছিলেন। বাংলাদেশের বিজয় দিবসের পর প্রতিবেশী মুসলমানেরা তাঁদের কাছে জিন্মা রাখা সকল স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী অক্ষত অবস্থায় বুঝে দিয়ে ছিলেন। ডেমড়া গণহত্যার পর থেকে আমরা দিন রাত গ্রাম পাহাড়া শুরু করলাম। প্রতিবেশী মুসলমান যুবকেরা আমাদের সহযোগিতার জন্য সাথে থাকলেন। বড়দের নির্দেশে সর্ব মো: আব্দুল মজিদ সরকার, আবুল কালাম সরকার, গোলাম মাহবুব নান্নু, আব্দুস ছাত্তার প্রামানিক, আনাইমোল্লা, ইমান আলী, নজরুল ইসলাম, লাল মিয়া, শামসুল হক ও অন্যান্যরা রাত দিন পালা করে করে আমাদের সাথে থেকে পাহাড়া দিল। আমাদের পরিবার কয়েক দিন রাতে প্রতিবেশী মুসলমানদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ঘুমাতাম। আমাদের গ্রামের মুসলমানেরা এত ভালো যে, তাঁরা আমাদের জন্য ঘর ও বিছানা ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বারান্দায় ঘুমাতেন। তখন আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিলাম ৮জন। ১. আমাদের পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল ২. মাতৃদেবী: নিলীমা রানী সান্যাল, ৩. বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল (সুকুমার) ৪. বড় বৌদি- শ্রীমতী রেখা রাণী সান্যাল, ৫. মেজদাদা-সমরেন্দ্র নাথ সান্যাল (ভবেশ) ৬. আমি ৭. ছোট ভাই-সৌমেন্দ্র নাথ সান্যাল (শমেন) ও ৮. একমাত্র ছোট বোন দুলালী রাণী সান্যাল। আমরা কয়েক দিন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আমাদের গ্রাম অপেক্ষা আরো প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বাচড়া গ্রামে আমাদের পিতৃদেবের শিষ্য মাখন লাল সিং এর বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে থাকলাম। একাকী মনে মনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। মানুষের বাড়িতে আর কত দিন থাকা যায়। আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে আমাদের পরিবার আবার গ্রামের বাড়িতে ফিরে এলাম। আমাদের গ্রামের আমরা ও অন্যান্য যুবকেরা নিজেদের উদ্যোগে রাত দিন পালা করে করে গ্রাম পাহাড়া দিতে থাকলাম। আর মুক্তিযুদ্ধের যাওয়ার পথ খুঁজতে থাকলাম। শ্রাবণ মাসের প্রথম দিক। দিনটি ছিল ৬ শ্রাবণ ১৩৭৮ ও ২৩ শে জুলাই’৭১ শুক্রবার। বর্ষাকাল। রাত ৮ টার দিকে দেখি আমাদের বাড়ির কাছে পালেদের বিলে একটি ছই ওয়ালা নৌকা। নৌকা দেখে এগিয়ে গেলাম। বাচড়া গ্রামের আমার পরিচিত মো: আব্দুল ওহাব কে দেখতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম। কী হবে? ওহাব বললো এম পি এ. জনাব মো: আব্দুর রহমান স্যার এলাকার ইচ্ছুকদের মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এর জন্য ভারত নিয়ে যাচ্ছেন। আমি বললাম তাহলে আমিও যাবো। আমি চলে এলাম বাড়িতে। গোপনে আমার জামা কাপড় গোছলাম। তারপর আমার পড়ার খাতার একটি পৃষ্ঠা ছিড়ে মাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিরকুট লিখলাম। চিরকুট টি ছিল-“মা, প্রণাম নিও, বাবাকে আমার প্রণাম দিও। বড় দাদা, মেজদাদা ও বৌদিকে প্রণাম দিও। ছোট ভাই

বোনকে স্নেহাশীষ দিও। আমি মুক্তিযুদ্ধে গেলাম। তোমাদেরকে বলে গেলে যেতে দিতে না জন্য না বলে চলে গেলাম। অপরাধ ক্ষমা করিও। আশীর্বাদ করিও। আমি যেন বিজয়ী হয়ে তোমাদের কাছে ফিরে আসতে পারি। ইতি- তোমার ছেলে দেবেশ।” দিন টি ছিল আমাদের গ্রামের হাটবার। পিতৃদেব হাট থেকে ভালো মাছ এনেছেন, মাতৃদেবী রান্না করছেন। আর কিছু ক্ষণ পরেই আমাদের সবাইকে খেতে ডাকবেন। আমি বাড়ির কাউকে না বলে গোপনে নৌকায় গিয়ে বসলাম। রাত ৮-৩০ মি: এর দিকে শাহজাদপুরের কয়েক জনকে সাথে নিয়ে একটা নৌকায় এম.পি.এ জনাব মো: আব্দুর রহমান স্যার এলেন। এম.পি.এ স্যার কে দেখে আমি দেখা করার জন্য এগিয়ে গেলাম। সামনে দাড়িয়ে আদাব দিলাম। আমাকে দেখে স্যার বললেন- দেবেশ, তুমি কেন? এত ছোট মানুষকে তো মুক্তিযুদ্ধে নিবেনা। আমি অনুরোধ করলাম। এম.পি.এ স্যার বললেন-ঠিক আছে চলো। তারপর রতন কান্দি পালেদের বিলের ঘাট থেকে রাত ৯-০০ টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। মানসিক ভাবে ভগবানকে প্রণাম করলাম। শুরু হলো এক কিশোরের জীবন পন যুদ্ধে যাওয়া। আমরা সুজানগর সাত বাড়িয়া হয়ে পদ্মা নদী পাড় হয়ে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানার চিলমারি ইউনিয়নের খারিজাথাক গ্রাম দিয়ে বাংলাদেশের বর্ডার অতিক্রম করলাম। আমরা ভারতের পশ্চিম বাংলার জলঙ্গী বর্ডার দিয়ে ভারতে ঢুকলাম। একটি বি.এস.এফ ক্যাম্পে ঢুকলাম। প্রাতঃক্রিয়াদি করে হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। বি.এস.এফ ক্যাম্পে এম.পি.এ স্যার ও আমাদের গাইডার কে চেয়ারে বসতে দিলেন। আমাদের সবাই কে এক লাইনে দাড় করালেন। আমাদের গণনা করা হলো। আমরা হলাম ২২ জন। এই ২২ জনের মধ্যে আমাদের গ্রামের আমরা ছিলাম ২জন। ১ সুনীল কুমার হাজরা ও ২. আমি। সুনীল কুমার হাজরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের ভয়াবহতা ও অন্যান্য শুনে পরে দেশে ফিরে এসে ছিলেন। এম.পি.এ স্যার যোগাযোগ করে আমাদের কে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। এম.পি.এ স্যার আমাদের সাথে মালদহ পর্যন্ত গেলেন। মালদহ বাজার থেকে মুড়ি ও কাঠাল কিনে আমাদের খাওয়ালেন। তারপর আমাদের কে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষনের জন্য কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে কোলকাতা চলে গেলেন। আমরা রাত ৯ টার দিকে কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁরা আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। পর দিন সকালে আমাদের সবাইকে ফলোইং করালেন। বয়সের স্বল্পতার কারণে ট্রেনিং কর্তৃপক্ষ আমাকে ভর্তি করলেন না। নিরুপায় হয়ে আমি আমার ওল্ড মালদহের পিশে মহাশয় বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তখন অধিকাংশ ভারতীয়রা বাংলাদেশের লোকদের কে জয় বাংলার লোক বলতো”। ভারতের ট্রেন ও বাসে বাংলাদেশের লোকের কোন ভাড়া লাগতো না। বাস ও ট্রেনে ভাড়া চাইতে এলে “ জয় বাংলা” বললেই বুঝতে পারতেন আমরা বাংলাদেশের শরণার্থী। কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে একটি বাসে কাছাকাছির একটি রেল স্টেশনে গেলাম। তার পর ট্রেন ধরলাম। বারসই রেলওয়ে জংশন স্টেশন থেকে ট্রেন বদলাতে হলো। আমি স্টেশনে বসে আছি। আমার কাছে ট্রেনের টিকেট নাই। মোবাইল কোর্টের লোক আমাকে ধরে নিয়ে গেল। একটি রুমে বসালো। যাদের ট্রেনের টিকেট নাই তাদের ম্যাজিস্ট্রেট এক এক করে ডেকে ডেকে জরিমানা করলেন। পর্যায়ক্রমে আমার পালা এলো। আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম “জয় বাংলা”। ওনারা বুঝতে পারলেন আমি বাংলাদেশ থেকে গিয়েছি। আমাকে জরিমানা না করে ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী ট্রেনে উঠে ওল্ড মালদহ স্টেশনে নেমে পিসে মহাশয় শ্রী বিশ্ব নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাক মোহন মহল্লার বাড়িতে গেলাম। কয়েক দিন ওল্ড মালদহ, গাজল, শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি আত্মীয় বাড়ি ঘুরলাম। আমার

পিশে মহাশয়ের এক ভগ্নিপতি ছিলেন একটি শরণার্থী ক্যাম্পের ইনচার্জ। তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন- “তুমি ছোট মানুষ তোমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। আমি তোমাকে শরণার্থী ক্যাম্পে ভর্তি করে নিচ্ছি। তুমি ক্যাম্পে থাকার মতো যাযগা। রেশন ও অন্যান্য সকল সুবিধা পাবে”। আমি বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের জন্য ভারত এসে শরণার্থী শিবিরে বসে বসে খাবো ইহাতে সন্মত হতে পারলাম না। আবার ফিরে এলাম কামার পাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে। আমাদের শাহজাদপুরের রবীন্দ্র নাথ বাগচী, মো: নজরুল ইসলাম ও রতন কুমার দাস সহ কয়েক জন কে পেলাম। তাঁরা আমাকে পরামর্শ দিলেন তুমি মালঞ্চ (কুরমাইল) ক্যাম্পের ইনচার্জ, ৭ নং সেক্টরের উপদেষ্টা ও বেড়া-সাঁথিয়া নির্বাচনী এলাকার এম.এন. এ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যারের কাছে যাও। আমি তাঁদের পরামর্শে অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্যার এর কাছে গেলাম। স্যারকে আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে মুক্তিযুদ্ধে ভর্তি করার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি করার ব্যবস্থা করলেন। আমিও কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে ভর্তি কর্তৃপক্ষকে আমাকে ভর্তি করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমার দেশ প্রেম, সাহসী মনোভাব ও অন্যান্য গুণে ভর্তি করলেন। প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে আমাদের ফলিং করিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো, পিটি প্যারেড করানো হতো। কদিন কামারপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্পে থাকার পর আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগচী, রতন কুমার দাস ও মো: নজরুল ইসলাম কে ট্রান্সফার করলো মালঞ্চ (কুড়মাইল) ট্রানজিট ক্যাম্পে, মালঞ্চ (কুড়মাইল) ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে আমাদের কে আনা হলো পতিরাম প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্পে। পতিরাম প্রাথমিক ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে হায়ার ট্রেনিং এর জন্য এক যোগে ভারতীয় আর্মি লরিতে আমাদের ২০/২২ জন কে নিয়ে আসা হলো দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমার পানিঘাটা নামক ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পে। ক্যাম্পে নিয়ে আমাদের তাবুর মধ্যে থাকার সিট করে দিল। আমাদের প্রত্যেক কে একটা মগ, একটা প্লেট, দুই টা প্যান্ট, ২টা গেঞ্জি, একটি মশারি, ও বিছানা পত্র দেওয়া হলো। ট্রেনিং শুরু হলো। প্রশিক্ষণ শুরুর দিনে প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর প্রথমে ফলিং করিয়ে প্রশিক্ষনের বিভিন্ন নিয়ম কানুন ও অন্যান্য বিষয়ে বললেন। তারপর তিনি বললেন দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান ক্যাপ্টেন ডি এস ভিলন স্যার আসবেন। ঠিক দুপুর ১২-০০টায় প্রশিক্ষণ প্রধান শিখ সেনা ক্যাপ্টেন ডি এস ভিলন স্যার এলেন। তিনি আমাদের সকল কে উদ্দেশ্য করে হিন্দিতে যা বললেন তার অর্থ হলো-“... আপনাদের কে স্যালুট। আপনারা বীর, আপনারা আপনাদের দেশ মাতাকে হানাদার মুক্ত করতে যুদ্ধ করার জন্য ট্রেনিং করতে এসেছেন। আমরা আপনাদের জন্য তেমন কিছু করতে পারবো না। আমরা মানবিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিব। আপনাদের দেশকে আপনাদেরই স্বাধীন করতে হবে। আপনাদের জন্য দাতা পিতা মাতাকে স্যালুট জানাচ্ছি। তাঁরা দেশের জন্য তাঁদের সন্তানদের কে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন...”। পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্প টি ছিল ৭ নং সেক্টরাধীন একটি হায়ার ট্রেনিং ক্যাম্প। পানিঘাটা স্থান টি ছিল চারি দিকে পাহাড়ের মধ্যে একটি বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলে বনমানুষ, নকশাল ও অন্যান্য খারাপ মানুষের বসবাস ছিল। স্থানটি ছিল কার্শিয়ান পাহাড় হইতে নেমে আসা একটি ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শ্বের বনাঞ্চল। আমাদের ট্রেনিং স্থানটি ছিল পূর্ব-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। চাঁন মারি স্থানের বামপাশে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝর্ণার জল। আমার জীবনে এই প্রথম পাহাড় থেকে ঝর্ণার জল আসা দেখলাম। ক্যানেলের দক্ষিণ পার্শ্বের পাড় ঘেঁষে মর্টার

ট্রেনিং হতো। মর্টারের গুলি গিয়ে পড়তো ক্যানেলের উত্তর পার্শ্বের জঙ্গলে। আমাদের ২১ দিনের ট্রেনিং হলো। আমাদের কে থ্রিনট থ্রি রাইফেল, এল, এম,জি,এস,এল,আর, স্টেনগান, টুইঞ্চ মর্টার, হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জ, এক্সপ্লোসিভের ব্যবহার, ফাষ্ট এইড সহ অন্যান্য ট্রেনিং দিল। যুদ্ধে সহযোদ্ধা আহত হলে বা শহীদ হলে করণীয় সম্পর্কে এবং ফাষ্ট এইড সম্পর্কে ধারণা দিল। ভারতীয় কয়েক জন হিন্দু বিহারী ও শিখ সৈন্য প্রশিক্ষণ দিলেন আমাদের কোম্পানীর। আমাদের কোম্পানীর নাম ছিল ডেল্টা কোম্পানী। প্রধান প্রশিক্ষক ছিলেন শিখ সেনা ক্যাপটেন ডি.এস. ভিলন। এফ.এফ ধারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিদায়ের পূর্বে শ্লেটে চক দিয়ে এফ.এফ নম্বর লিখে বুকের উপর ধরিয়ে ছবি তোলা হতো। কিন্তু আমাদের কোম্পানীর প্রশিক্ষণার্থীদের বিদায়ের পূর্বে কদিন ধরে বৃষ্টি হলো। আবহাওয়া জনিত কারণে আমাদের ছবি তুলতে পারলেন না। বিদায়ের সময়ে জানতে পারলাম আমার এফ.এফ. নং-৪৭৪২। ট্রেনিং শেষে ইন্ডিয়ান আর্মি ট্রাক যোগে আমাকে, রবীন্দ্র নাথ বাগচী, মো: নজরুল ইসলাম ও রতন কুমার দাস ও অন্যান্য প্রায় ৫০ জন কে নিয়ে আসা হলো ৭ নং সেক্টরের হেডকোয়ার্টার তরঙ্গপুরে। ইহা ছিল পশ্চিম বাংলার কালিয়াগঞ্জ থানার তরঙ্গপুর নামক স্থানে অবস্থিত। তরঙ্গপুর এনে সিরাজগঞ্জ জেলার কয়েক জনের সমন্বয়ে একটি গেরিলা গ্রুপ করা হলো। আমাদের গ্রুপের গ্রুপ লিডার/কমান্ডার নিযুক্ত হলেন বেলকুচি থানার তামাই গ্রামের জনাব এম.এ মান্নান। ডেপুটি লিডার/কমান্ডার নিযুক্ত হলেন শাহজাদপুর থানার জামিরতা গ্রামের অধিবাসী বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী। আমাদের কে তরঙ্গপুর থেকে অস্ত্র, গোলা-বারুদ, রেশনিং ও পকেট মানি দেওয়া হলো। আমার নামে একটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এক ম্যাগজিন ও এক বেল্ট গুলি, একটি বেয়নেট ও একটি হেলমেট ইস্যু করা হলো। অন্যান্য গোলা বারুদ, মাইন,গ্রেনেড ও এক্সপ্লোসিভ কমান্ডার স্যারের দায়িত্বে দিলেন। মৃত্যু যে হবেনা এমন কোন গ্যারান্টি ছিল না। তাই আমি মৃত্যুর প্রস্তুতি ও যুদ্ধ জয়ের জন্য তরঙ্গপুর বাজার থেকে একখানা শ্রী শ্রী চন্ডি গ্রন্থ, একটি বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ও একটি ৪ ব্যান্ডের রেডিও কিনলাম। তরঙ্গপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত বাসে এসে ট্রেনে উঠলাম। শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংসন স্টেশনে এসে আমাদের ট্রেন বদলাতে হলো। শিলিগুড়ি স্টেশনের প্লাট ফরমে গ্রুপের সকলের সাথে বসে আছি। দেখলাম আমাদের প্লাট ফরমের সামনের লাইনে একটা ফাঁকা ট্রেন দাড়িয়ে আছে। আমি প্রশ্ন করার জন্য ট্রেনের একটি টয়লেটে ঢুকলাম। এমন অবস্থায় ট্রেনটি স্টার্ট করলো। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাড়াগুড়া করে টয়লেট থেকে বের হয়ে লাফ দিয়ে প্লাট ফরমের উপর নেমে পড়লাম। আমার হাটুতে ব্যাথা লাগলো। আজ ভাবি-তখন পকেটে কোন আইডি কার্ড ছিল না। আমার অপরিচিত যায়গা। ওখানকার একজন মানুষও আমাকে চেনে না। আমি মারা গেলে আমার সাথীরাও আমাকে খুঁজে পেতেন না। আমার লাশ কবর হতো কী দাহ হতো নিশ্চয়তা ছিল না। আমার বাবা-মা সারা জীবন আমার পথ প্রানে চেয়ে থাকতেন। আমার লাশ টাও পেতেন না। পরে ট্রেন বদলীয়ে আসাম গামী ট্রেনে উঠলাম। আসাম গামী ট্রেনে ধুপরী নামক স্টেশনে আমরা নামলাম। তারপর বাস যোগে মানিকার চর এলাম। রাত হয়ে যাবার কারণে রাতে মানিকার চর একটা ভাড়া বাড়ি এ থাকলাম। পরদিন সকালে মানিকার চর থেকে নদী পার হয়ে এলাম তদানীন্তন রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহকুমার (বর্তমানে জেলা) মুক্তাঞ্চলে স্থাপিত রৌমারী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। রৌমারী ক্যাম্পে আমরা স্নান খাওয়া দাওয়া করলাম। আমাদের কমান্ডার স্যার সিরাজগঞ্জ জেলার মুক্তাঞ্চল যমুনার চড়ে পৌঁছানোর জন্য একটি বড় ছই ওয়ালা

নৌকা ভাড়া করলেন। রৌমারী ক্যাম্প থেকে রাতের খাবার খেয়ে রাত ৯:০০ টার দিকে আমাদের নৌকা ছাড়লো। ইহা ছিল ৬ সেপ্টেম্বর'৭১। নৌকা বাহাদুরাবাদ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট, কাজিপুর থানা ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে আসতে হয়। আমরা জানতে পেরে ছিলাম। বাহাদুরাবাদ ঘাট অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ এলাকা। ঐ ক্যাম্পের পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা ভয়ানক। তারা স্পীড বোট নিয়ে রাতে নদী টইল দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নৌকা পেলে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাম্প নিয়ে অমানুষিক অত্যাচার করে নৃশংস ভাবে হত্যা করে। আমাদের কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার নির্দেশ দিলেন-“আপনারা সবাই নৌকার ডঙরার মধ্যে পজিশন অবস্থায় থাকুন। পাকিস্তানি হানাদারেরা ধরতে এলে আমরা ধরা দিব না। যুদ্ধ করবো। যুদ্ধ করে শহীদ হবো। কিন্তু ওদের হাতে ধরা দিব না”। রাত ২.০০ টার দিকে আমরা বাহাদুরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করতে থাকলাম। ওদের সার্চ লাইটের আলো এসে বার বার আমাদের নৌকাতে পড়ছিল। ভগবানের কৃপায়-ওরা আর স্পীড বোট নিয়ে ধরতে এলোনা। আমরা বাহাদুরাবাদ ঘাট এলাকা অতিক্রম করলাম। আমাদের সাথে চিড়া গুড় ছিল। ভোরে মাঝিরা এক কাইসা খেতের মধ্যে নৌকা ঢুকিয়ে দিল। আমরা নীচে নেমে খেতের মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করলাম। আমাদের সাথে থাকা চিড়া ও গুড় দিয়ে সকালের জলখাবার খেলাম। তার পর নৌকা আবার ছাড়লো। তখন কাজিপুর থানার অধিকাংশ এলাকা সহ বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তানি হানাদারদের দখলে। কাজিপুর থানার সম্মুখ দিয়ে আমাদের নৌকা আসবে। দেখে শুনে খোঁজ নিয়ে থামিয়ে থামিয়ে ৪ দিন ভরে নৌকা এসে পৌছালো সিরাজগঞ্জ হানাদার মুক্তাঞ্চল যমুনার চরে। ইহা ছিল টাঙ্গাইল জেলার সিংগুলির চড়েরনিকটবর্তী। নৌকাতেই রান্নার ব্যবস্থা ছিল। মাঝিরা কোন রকমে ডালভাত অথবা খিচুরী রান্না করে আমাদের খাওয়াতো। এই ভাবে খেয়ে না খেয়ে চলছিলাম। পরদিন রাতে যমুনা নদীর এপাড়ে চলে এলাম। চলে এলাম বেলকুচি-কামারখন্দ নির্বাচনী এলাকার এম.এন.এ জনাব মোঃ আব্দুল মোমিন তালুকদারের গ্রামের বাড়িতে। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ভাই মোঃ রশিদ তালুকদার আমাদের থাকা খাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করলেন। অক্টোবর'৭১ মাসের আগ পর্যন্ত আমাদের গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা সংখ্যা কম থাকায় সম্মুখ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত কমান্ডার স্যার নেন নি। কমান্ডার স্যারের কাছে জানলাম জনাব মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আমির হোসেন ভুলু এর গ্রুপ ও অন্যান্য আরো কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ আমাদের এই এলাকাতেই আছেন। আমরা পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ও তাদের দোসরদের আতঙ্কে রাখার জন্য গেরিলা কার্যক্রম “হিট এন্ড রান” (আঘাত কর এবং সড়ে পর) চালাতাম। পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার ক্যাম্পের নিকট বর্তী গিয়ে ২/৪ টা থ্রি নট থ্রি রাইফেলের আকাশ মুখি ফাঁকা গুলি ছুড়ে চলে আসতাম। পাকিস্তানি দালাল, পীচ কমিটির লোক ও অন্যান্যরা আমাদের অস্তিত্বের কথা জেনে ভয় ও আতঙ্কে থাকত। প্রথমত ভয় ও আতঙ্কে রাখাই ছিল আমাদের কাজ। সারা দেশের অধিকাংশ যায়গা রাজাকারেরা গ্রামে গিয়ে খাসী, মুরগীও অন্যান্য জিনিস জোর করে নিয়ে আসতো। বাজারে বাজারে গিয়ে লুটতরাজ ও চাঁদাবাজী করতো। আমাদের গ্রুপ বাজারে চাঁদাবাজী করতে আসা রাজাকারদের ধরে আনার জন্য ২টি অপারেশন করেছি। আমরা দিনের বেলা স্কুলে বা কারো বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতাম। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে দেশের অভ্যন্তরে ছিল দুইটি পক্ষ। একটি স্বাধীনতার পক্ষে। অন্যটি স্বাধীনতার বিপক্ষে। আমাদের কার্য এলাকার অধিকাংশ মানুষ ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। স্বাধীনতার বিপক্ষের পীচ কমিটির সদস্য, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও

অন্যান্যরা। স্বাধীনতা বিরোধীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের তথ্য দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে এসে বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ, চাঁদাবাজি করতো। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দাতা বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করতো। হিন্দু ও আওয়ামী লীগ নেতারা ছিল ওদের বড় টার্গেট। হিন্দু নারী পুরুষকে ধরে নিয়ে যেত। নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যা করতো। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধারাও বিশেষ ভাবে অত্যাচারী পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকারদের হত্যা করতো। গণহত্যা, ধর্ষণ ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী কাজে সরাসরি জড়িত কোন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যকে ধরতে পারলে ফায়ারিং স্কোয়ারে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। যে কারণে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে সাহসী একজনকে জল্লাদ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। আমাদের গ্রুপের জল্লাদ হিসেবে মনোনীত ছিলেন দৌলতপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক। আমরা এমন কোন পাকিস্তানি হানাদার সৈন্য ধরতে পারি নাই। আমরা কখনো কাউকে মারি নাই। আমাদের গ্রুপের নীতি ছিল- “আমরা আমাদের দেশী কোনো ভাইকে হত্যা করবো না। বুঝিয়ে তাদেরকে স্বাধীনতার পক্ষে আনবো” যে কারণে আমাদের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ কোন স্বাধীনতা বিরোধীকে ধরি নাই, শাস্তি দেই নাই বা হত্যা করি নাই। আমরা নিজেরা বা তাদের আত্মীয়ের মাধ্যমে বুঝিয়ে বিভিন্ন ভাবে স্বাধীনতা বিরোধীদের স্বাধীনতার পক্ষে আনার চেষ্টা করতাম। আমাদের হাতে আগ্নেয় অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্কে থাকতাম। যে কোন সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমাদের থাকা খাবার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। নিজেরা রান্না করে খাবো এমন কোন থালা বাসন আমাদের কাছে ছিল না। আমরা আজ এ শেল্টারে কাল সে শেল্টারে থাকতাম। আমরা নিম্ন শব্দে তরঙ্গপুর বাজার থেকে আমার কেনা রেডিয়োতে “স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র” শুনতাম। প্রতিদিন রাতে কমান্ডার স্যার আমাদেরকে পাশওয়ার্ড দিতেন। কোথাও আক্রমণের পূর্বে আমরা যুদ্ধে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে কোন শেল্টার একত্রিত হবো। তা নির্ধারণ করে দিতেন। কোন শেল্টারেই একাধিক দিন থাকতাম না। কোন কোন দিন কোন বাড়িতে শেল্টারের অভাবে সারারাত চিড়া গুড় খেয়ে রাত্রি জেগে স্কুলের বেঞ্চে শুয়ে থাকতে হতো। আমাদের কাছে কোন মশারি, বালিশ, লেপ কাঁথা ও অন্যান্য ছিল না। কি যে অসহনীয় কষ্ট। আমাদের শেল্টার পালা ক্রমে আমরা দু’জন করে করে পাহাড়া দিতাম। এক দলের ডিউটি শেষ হলে। তাঁরা দুই জন পরবর্তী দুই জনকে ডিউটিতে দাড়ানোর জন্য ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন। ঘুম থেকে উঠে পাহাড়ায় দাড়ানো আমার জন্য খুব কষ্টের ছিল। প্রতি রাতে কমান্ডার স্যার আমাদের পাশ ওয়ার্ড দিতেন। আমরা আমাদের শেল্টার ডিউটি দেওয়ার সময়ে কোন লোক এলে “হল্ট” বলে দাড় করাতাম। তারপর “হ্যান্ডস আপ” বলে হাত উপরে উঠাতে বলতাম। তার পর জিজ্ঞাসা বাদ করে নিশ্চিত হয়ে যেতে দিতাম। আমরা রাতে বিভিন্ন রাজাকারদের বাড়িতে গিয়ে তাদের আত্মীয় স্বজনকে বুঝাতাম। সকালে আমরা অস্ত্রে ফুল থু মারতাম, পরিস্কার করতাম ও অস্ত্রে তেল দিতাম। তখন দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। আমরা একেক দিন একেক জনের বাড়িতে খাওয়া - দাওয়া করতাম। স্বাধীনতা বিরোধীদের ভয়ে অনেকে আমাদেরকে শেল্টার বা খাবার দিতে সাহস পেতেন না। কারণ অধিকাংশ গ্রামেই ছিল ২/১ জন করে পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকার। তারা খোঁজ জানলে পার্শ্ববর্তী আর্মি বা রাজাকার ক্যাম্পে সংবাদ দিয়ে তাদেরকে নিয়ে এসে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিবে, বাড়ির মালিককে ধরে নিয়ে হত্যা করবে ও অত্যাচার চালাবে এই ছিল তাদের ভয়। আমাদের সাথে সব সময় চিড়া গুড় থাকতো। আমাদের গ্রুপ বাংলাদেশে আসার

কয়েক দিন পরই গ্রুপ থেকে ছুটি নিলাম। পিতৃদেব ও মাতৃদেবী সহ সকলের সংবাদ জানার জন্য গ্রামের বাড়ি শাহজাদপুর থানার রতন কান্দি গ্রামে এলাম। গ্রামের বাড়িতে এসে দেখলাম আমাদের বাড়িঘর সব কিছু গ্রামের মোঃ হোসেন আলীর কাছে শর্ত সাপেক্ষে মোটা মুটি বিক্রয় করে আমাদের পারিবারের সবাই আমার খোঁজে ভারতে চলে গেছে। আমি আমাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু ননী গোপাল হলদার দের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। মোঃ হোসেন আলী এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন- “তোমার জন্য তোমার বাবা-মা পাগল প্রায় হয়ে-পড়ায় তোমাদের বাড়িঘর সব কিছু আমার কাছে শর্ত সাপেক্ষে বিক্রি করে তোমাকে খোঁজার জন্য ভারতে গেছেন। শর্তানুসারে কিছু টাকা নিয়ে গেছেন। দেশ স্বাধীন হলে সবাই ফিরে এলে আমার টাকা ফেরৎ দিলে আমি বাড়িঘর ও অন্যান্য সব ফেরৎ দিব। রাতে ননী গোপাল হলদারদের বাড়িতে থাকলাম। ননী গোপাল আর আমি সারারাত প্রায় নিঃশুম কাটলাম। ননী গোপাল আমার কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার সব কথা শুনলো। সে আমাকে বললো- শাহজাদপুর কাঠের ব্রীজের পশ্চিম পাড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা এক হিন্দু মেয়েকে নির্যাতন করে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এর কাছারী বাড়ির সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জেলার জলের মধ্যে নামিয়ে গুলি করে হত্যা করেছে। শাহজাদপুরে মোঃ মজিবর রহমান নামক একজন অত্যাচারী রাজাকার আছে। তার নেতৃত্বে শাহজাদপুর সদর সহ বিভিন্ন এলাকায়- বিভিন্ন ভাবে লুটতরাজ, নির্যাতন ও অন্যান্য মানবতা বিরোধী কাজ হচ্ছে। শাহজাদপুরের গিরিধারী কুন্ডুর যুবতী মেয়ে মনোরমা কুন্ডু (মোনো) কে মোঃ মোন সরকার নামক এক রাজাকার ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিয়ে বাড়িতে আটকিয়ে রেখেছে। ১ সেপ্টেম্বর’৭১ কৈজুরী রাজাকার ক্যাম্পের নেতৃত্বে রাত তিন টার দিকে পুঠিয়া গ্রামের অধিবাসী, খুকনী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিতেন্দ্র নাথ চন্দ কে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে গুলি করে হত্যা করেছে। হত্যাকারীরা তাঁর লাশ পুঠিয়া গ্রাম দিয়ে যাওয়া রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল। শাহজাদপুর থানায় ৪টি রাজাকার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১. শাহজাদপুর সদর রাজাকার ক্যাম্প ২. কৈজুরী রাজাকার ক্যাম্প ৩. কর শালিকা রাজাকার ক্যাম্প ও ৪. পোরজনা রাজাকার ক্যাম্প। শাহজাদপুর রাজাকার ক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছে পাকিস্তানি সৈন্য ও অন্যান্যদের নির্দেশ মত। কৈজুরী রাজাকার ক্যাম্প নিয়ন্ত্রন করেন ব্যারিষ্টার মোঃ কোরবান আলী। ব্যারিষ্টার মোঃ কোরবান আলী জামায়াতে ইসলামীর এক জন বড় নেতা। তিনি জামায়াতে ইসলামী এর মনোনীত প্রার্থী হিসাবে শাহজাদপুর আসনে এম এন এ পদে প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন। তিনি আওয়ামীলীগ প্রার্থী সৈয়দ হোসেন মনসুর তারা মিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়েছেন। কৈজুরী রাজাকার ক্যাম্প থেকে রাজাকারেরা বেলতৈল গ্রামে হানা দিয়ে হিন্দুদের অনেক বাড়িতে লুটতরাজ করেছে। বেলতৈল বাজার থেকে অনিল এবং সুনিল ঘোষ নামক দুই সহোদরকে ধরে নিয়ে কৈজুরীতে নিয়ে গিয়ে অমানবীয় নির্যাতন ও অত্যাচার করে হত্যা করেছে। আমাদের ভৈরব পাড়ার নারায়ণ চন্দ্র সরকার কে তাঁর শত্রুরা হত্যা করিয়েছে। ভৈরব পাড়ার নারায়ণ চন্দ্র সরকার কে যে দিন হত্যা করে সে দিন টি আমাদের রতন কান্দি গ্রামের হাট বার ছিল। শুক্রবার। বিকাল ৫টার দিকে মাছের বাজার থেকে ভৈরব পাড়ার নারায়ণ চন্দ্র সরকার কে ৫/৬ জন মুক্তিযোদ্ধা এসে ধরেছিল। এই গ্রুপে আমাদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক ছিল। সম্ভবত এই গ্রুপ নারায়ণ চন্দ্র সরকার এর কোন শত্রু পক্ষের কাছ থেকে হয়তো টাকা নিয়ে তাঁকে হত্যা করার চুক্তি নিয়ে ছিল। ঐ দিন হাট থেকে নারায়ণ চন্দ্র সরকার ইলিশ মাছ কিনে ছিলেন। তাঁর হাতে ছিল ইলিশ

মাছ। কিলিং দলের ৫/৬ জন রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্র তাক করে ভয় দেখিয়ে ওনাকে ধরে চোখ বেঁধে ফেললো। হাটের লোক জন ওনাকে না মারার জন্য অনুরোধ করলো। কিন্তু চুক্তি নেওয়া হত্যা কারীরা কিছুই শুনলো না। চোখ বাঁধা অবস্থায় হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে চললো। ঐ দলের মোঃ শামছুল হক আমাদের গ্রামের মোঃ ইছা সরকারদের বিয়াই হয়। আত্ম বিশ্বাস নিয়ে মোঃ ইছা সরকার আরো কয়েক জন কে সাথে নিয়ে ওদের পিছু পিছু নারায়ন চন্দ্র সরকারকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করতে করতে গেলেন। কিন্তু হত্যা কারীরা হয়তো একটা নিদিষ্ট টাকার বিনিময়ে তাঁকে হত্যা করার চুক্তি নিয়ে ছিল। জিগার বাড়িয়া গ্রামের কাছে গিয়ে হত্যাকারীরা অস্ত্র তাক করে ওনাদের কে বলে ছিল- আপনারা যান, নারায়ন চন্দ্র সরকার কে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব না। নিরুপায় হয়ে মোঃ ইছা সরকাররা ফিরে এসে ছিলেন। নারায়ণ চন্দ্র সরকার কে ধরে নিয়ে গেছে সংবাদটি পেয়ে তাঁর বিধবা মা, স্ত্রী ও অবুঝ ছেলে মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে খুঁজতে গিয়ে ছিল। হত্যাকারীরা জিগার বাড়িয়া ও হাসাকোলা গ্রামের মাঝখানে ক্ষেতের মধ্যে গুলি করে হত্যা করে লাশ রেখে গিয়েছিল। গুলির শব্দ জিগার বাড়িয়া গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী হাসাকোলা সহ বিভিন্ন গ্রামের লোকজন শুনছিল। খুব শক্তি শালী সুঠাম শরীরের অধিকারী ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র সরকার। তাঁকে গুলি করার পর নাকী ২/৩ হাত উপরে উঠে মাটিতে পড়ে কিছু সময় গোত্রাণীর পর মারা গিয়ে ছিলেন। কয়েক দিন হয়েছে উল্লাপাড়া থানার লাহিড়ী মোহন পুর গ্রামের লাহিড়ী পাড়ায় পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা স্বাধীনতা বিরোধীদের সহযোগিতায় গণহত্যা করেছে। এই গণ হত্যায় অধিকাংশ হিন্দু নর নারীকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। গণ হত্যার পর স্থানীয় লোকদের কে দিয়েই লাশ গুলো নিকট বর্তী লাহিড়ী মোহনপুর রেল স্টেশনের দহকুলা রেল লাইনের পাশে স্তুপাকার করে ফেলে রাখতে বাধ্য করেছিল পোরজনা রাজাকার ক্যাম্পের কমান্ডার হয়েছে মহারাজ পুরগ্রামের আতাউর রহমান, আতা। তারা পোরজনা গ্রামের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মনীন্দ্র নাথ ঘোষ কে অমানবীয় নির্যাতন করে পরে হত্যা করেছে। মোটা মুটি সারারাত ননী গোপাল হলদার এর কাছ থেকে বিভিন্ন লোমহর্ষ কাহিনী শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। শুনলাম আমাদের গ্রামের কারিগর পাড়ার মোঃ ওসমান আলী ও দক্ষিণ পাড়ার মোঃ আব্দুর রহিম ও মোঃ আব্দুর রহমান সহ কয়েকজন রাজাকারে ভর্তি হতে চাচ্ছে। কারিগর পাড়ার মোঃ বাইনা সরকার করশালিকা রাজাকার ক্যাম্পে কমান্ডার মাওঃ মোঃ আব্দুল খালেকের সাথে যোগাযোগ করে রাজাকারে ভর্তি হয়েছে। তিনি কিছু দিন পূর্ব থেকেই কর শালিকা গ্রামে থাকতেন। আমার গ্রামের আসার সংবাদ পেয়ে আমার বন্ধু মোঃ আব্দুল কালাম সরকার সহ কয়েক জন আমাকে দেখতে এলো। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে চায় বললো। বিভিন্ন খারাপ চিন্তা আমার মাথায় এলো। গ্রামে আর দেবী না করে আমার মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রতন কান্দি বাড়ি থেকে রওনা হয়ে হেঁটে হেঁটে ১.০০ টার দিকে গিয়ে পৌঁছলাম আমাদের বড় তাই মহাশয় দ্বিজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর বেলকুচি থানার মুকন্দ গাঁতী গ্রামের বাড়িতে। আমি পার্শ্ববর্তী কারিগর বাড়ির চিবি রাস্তা দিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়লাম। আমাকে দেখে তাই মহাশয় ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। আমাকে তাড়াতাড়ি করে ঘরের মধ্যে নিয়ে বসালেন। বড়ঘরে বিছানার উপর বসালেন। ইহার পর তাই মহাশয় বললেন- বাবা, তোমার বাবা-মা ও অন্যান্যরা সবাই তোমার জন্য ভারতে গেছে। তোমার জন্য তোমার বাবা-মা প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। তোমার আমাদের বাড়িতে অবস্থান করা ঝুঁকি পূর্ণ। আমাদের বাড়ির পার্শ্বের এক মেস্বার ও অন্যান্য আরো কয়েক জন রাজাকার হয়েছে। রাজাকারেরা প্রতি দিন

আমাদের বাড়ি আসে। খোঁজ নেয় বাড়িতে কোন আত্মীয় স্বজন এলো কীনা। তারা তোমাকে দেখলে ধরে নিয়ে যাবে। মাঐ মা বড় ঘরের মধ্যেই আমাকে খেতে দিলেন। কত্তা, দেবকুমার, তপতি, নির্মল ও অন্যান্যরা এসে আমাকে দেখলো। আমি তাড়াতাড়ি করে খেয়ে কত্তা, তাঐ মহাশয় ও মাঐ মাকে প্রণাম করে কারিগর বাড়ির মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি গ্রাম ছেড়ে চলে এলাম। তারপর হেঁটে হেঁটে বেলকুচি থানার বয়ড়া মাসুম নামক গ্রামে অবস্থিত আমার গ্রুপে যোগ দিলাম। আমার কমান্ডার স্যার কিছু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ট্রেনিং দেওয়ায় আমাদের সাথে নিলেন। আমি মুক্তিযুদ্ধে যাবার কারণে আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী পাগল প্রায় হয়ে গিয়ে ছিলেন। একটি অবুঝ কিশোর ছেলের পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ! আমাকে খুঁজে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ও রাজাকারদের আলাটিমেটামে গণহত্যার হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গোটা পরিবার বাড়িঘর শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় করে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে ভারতের আসামের মানিকার চড় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। কোথায়ও আক্রমণের পূর্বে আমরা রেকী করে দেখতাম। “জয় বাংলা” ছিল আমাদের রণাঙ্গণের প্রধান ধ্বনি। আমি গ্রুপ কমান্ডারের কাছ থেকে ২ দিনের ছুটি নিয়ে সাঁথিয়া থানার শঙ্কর পাশা গ্রামে গিয়ে ছিলাম। শঙ্কর পাশা ছিল আমাদের মাসীর বাড়ি। আমাদের দাদুর (মাতৃদেবী বাবা) বাড়ি ছিল বেড়া থানার নাকালিয়ার নিকটবর্তী পৌঁচা কোলা নামক গ্রামে। আমাদের দাদুর নাম শ্রী অজিত চক্রবর্তী। আমাদের মেশো মহাশয় ডা. অমল চন্দ্র রায় এবং মাসীমা সুনীতি রানী চক্রবর্তী রায়। আমি একদিন মাসীমার বাড়িতে থেকে পরদিনই চলে এলাম। মেশো মহাশয় ও মাসীমা কিছুতেই আমাকে আসতে দিতে চাইলেন না। মাসীমা বলেন- “বাবা-তুই ছোট মানুষ তুই ভয়ংকর পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করে পারবিনা। তোর বাবা-মা তোর জন্য পাগল প্রায় হয়ে গেছে, তুই আমাদের এখানে থাক”। আমি মেশো মহাশয় ও মাসীমা কে প্রণাম করে হাঁটা পথে এসে আমাদের গ্রুপে বেলকুচি থানার বয়ড়া মাসুম গ্রামের পাশ্ববর্তী গ্রামে যোগদান করলাম। আমি আমার গ্রুপ কমান্ডার ও রণাঙ্গণের সাথীদের বলে রেখে ছিলাম-“ আমি রণাঙ্গণে মারা গেলে, তরঙ্গপুর বাজার থেকে আমার কেনা জাতীয় পতাকা দিয়ে মুড়িয়ে আমার লাশ নদীতে দিয়ে দিবেন”। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গণে আমি মারা গেলে তখন বাংলাদেশে আমার লাশ নিয়ে দাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার মত পরিবারের কোন লোক ছিল না। রণাঙ্গণে মারা গেলে লাশ নিয়ে গ্রামে যাওয়ারও অবস্থা ছিলনা। আমি দুই জন গ্রুপ কমান্ডারের অধীনে সম্মুখ/গেরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। এক- গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান এবং দুই ডেপুটি গ্রুপ কমান্ডার (গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী এর কমান্ডানাধীনে। গ্রুপ কমান্ডার এম.এ মান্নান স্যার এর অধীনে ১. বেলকুচি থানা অপারেশন ২. কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিহিত এ্যাম্বুস ও ৩. বেলকুচি থানার (বর্তমানে উপজেলার) কল্যাণপুর যুদ্ধ। বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীনে ধীতপুর যুদ্ধ। আমাদের গ্রুপের গেরিলা/সম্মুখ যুদ্ধগুলোর বিবরণ হলোঃ-

১. বেলকুচি থানা অপারেশন :

বেলকুচি সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য থানা। এই থানা অপারেশনে নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যার। ২৪ অক্টোবর’৭১ কমান্ডার স্যারের ও আরো ৩ জনের রেকিতে একযোগে বেলকুচি থানা ও মুসলিমলীগ নেতা মোঃ আব্দুল মতিনের বাড়ি আক্রমণ করে ছিলাম। সন্ধ্যায় বানিয়া গাতি শেল্টারে কমান্ডার স্যার বিস্তারিত ব্রিফ করে ছিলেন। কমান্ডার স্যার আমাদের গ্রুপ কে দুই

গ্রুপে ভাগ করে দিয়ে ছিলেন। সিদ্ধান্ত ছিল কমান্ডার স্যারের নেতৃত্বে বড় গ্রুপটি থানা আক্রমণ করবে। অন্য গ্রুপটি রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ নেতা মোঃ আব্দুল মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করে মতিন সাহেবকে ধরে আনবে। আমি কমান্ডার স্যারের গ্রুপে থেকে থানা আক্রমণ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ছিলাম। রাত ৯ টায় বানিয়া গাতি শেল্টার থেকে যাত্রা করে ছিলাম। থানার কাছে গিয়ে দুই গ্রুপ টার্গেটের উদ্দেশ্যে ভাগ হয়ে ছিলাম। রাত ১২টায় একযোগে আক্রমণের সিদ্ধান্ত। পরিকল্পনা মোতাবেক আমাদের গ্রুপ থানার পশ্চিম পাশ দিয়ে স্ট্রেলিং করে থানার সামনে যেতেই সেন্দ্রি দেখে ফেলে ছিল। হুইসেল বাঁজিয়ে থানার সবাইকে জানিয়ে দিয়ে আমাদের কে লক্ষ্য করে সেন্দ্রি গুলি করা শুরু করেছিল। তাঁরপর আমাদের গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান কমান্ড করে ফায়ার ওপেন করে ছিলেন। তারপর সবাই একযোগে গুলি শুরু করে ছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধটি ছিল ভয়াবহ যুদ্ধ। আমার মাথায় হেলমেট ছিল। দুইটি গুলি এসে আমার হেলমেটে লেগেছিল। আমার ডান পাশে অবস্থান নিয়ে ছিলেন যুদ্ধের কমান্ডার। বিজয় আর না হয় মৃত্যু ছাড়া কোন পথ ছিল না। আমরা সবাই বৃষ্টির মত গুলি চালাচ্ছিলাম। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কমান্ডার স্যার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন- “দেবেশ মাথা তুলো না, গুলি চালিয়ে যাও”। আমাদের গুলির কাছে হেরে গিয়ে থানার পুলিশ ও রাজাকারেরা থানার পিছনদিক দিয়ে পালিয়ে সোহাগপুর যমুনা নদীতে থাকা একটি লঞ্চে আমাদের রেঞ্জের বাইরে যমুনার মধ্যে চলে গিয়েছিল। থানার সেন্দ্রি গুলি করা বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করলো। তারপর আমরা সবাই থানার ভিতরে ঢুকে পড়ে ছিলাম। থানার মাল খানা থেকে সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে ছিলাম। এই যুদ্ধে দু’জন রাজাকারকে জ্যাক্ত ধরে নিয়ে এসে ছিলাম। ভোর হয়ে গিয়েছিল। মতিন সাহেবের বাড়ি আক্রমণ করা দলটিও এলো। মতিন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে ধরা সম্ভব হয় নাই। মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে অধিকাংশ বাড়ি ও দোকানে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরি করে রেখেছিল। থানার আশেপাশের লোকজন দোকান ও বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। বিজয়ী হয়ে আমরা ভোরের দিকে কিছু সময় বিজয় উল্লাস করলাম। তারপর ধরে আনা রাজাকার দুই জন সহ আমরা বেলকুচি থানার একটি নিভৃত গ্রামে শেল্টার নিলাম। ঐ দিন বেলা ১১.০০ টার দিকে সিরাজগঞ্জ সদর থেকে বেশ কিছু পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকারেরা বেলকুচি থানায় এলো। তারা বেলকুচি থানার আশে পাশের কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে কয়েক জন যুবক কে ধরে এনে অত্যাচার করেছিল। বেল কুচি থানা অপারেশনের সময়ে আমরা ২ জন রাজাকার কে ধরে এনে ছিলাম। প্রথমত রাজাকার দুইজন কে আমাদের শেল্টারের একটি রুমে চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। আমি আমার গ্রুপ কমান্ডার স্যারের অনুমতি নিয়ে তাদের রুমে গেলাম। আমি রুমে ঢুকে তাঁদের নাম ও ঠিকানা জানলাম। তাঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন আমাদের চোখের বাঁধন খুলে দিন। আমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমি রাজাকার ২ জনের চোখের বাঁধন খুলে দিলাম। তারপর তাদের রাজাকার হওয়ার প্রেক্ষাপট জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা যা বললেন- তার মোটা মাটি অর্থ হলো- আমরা রাজাকার সম্পর্কে কিছু বুঝিনা। আমরা গরীব মানুষ। আমরা বিবাহিত। আমাদের পরিবারে বাবা, মা স্ত্রীও ছেলে মেয়ে আছে। আমরা রাজাকার হওয়াটা একটি চাকরি মনে করে রাজাকারে ভর্তি হয়েছি। আমরা কাউকে কোন প্রকার অত্যাচার করি নাই। আমরা কখনো পাকিস্তানি সৈন্যদের কে সাথে নিয়ে গিয়ে কোন বাড়ি লুটতরাজ করি নাই। কোন বাড়িতে আগুন দেই নাই। কোন মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি- চিনিয়ে দেই নাই। আমরা চাকরি করি, বেতন পাই। সেই টাকা দিয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ করি। আপনি দয়া করে সবাই কে বলে আমাদের কে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আমরা আর রাজাকারে ফিরে যাবো না”। তাদের দেখে ও তাঁদের কথা শুনে মায়া হলো। দুপুরে রাজাকার দুই জনকে সাথে নিয়ে সবাই এক সাথে বসে খেলাম। বিকালে কমান্ডার স্যার কে তাঁদের সাথে আলাপ চারিতার কথা বললাম। তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। রাত ৯.০০ টার দিকে আবার রাজাকার দুই জন কে সাথে নিয়ে শেল্টারে বসে এক

সাথে খাওয়া দাওয়া করলাম। তারপর শেল্টার পরিবর্তনের জন্য যাত্রা করলাম। চলার পথে কমান্ডার স্যার কে রাজাকার দুইজনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানালাম। কমান্ডার জনাব এম, এ মান্নান স্যার ছিলেন শিক্ষিত ও ভালো মানুষ। তিনি আমার অনুরোধে রাজাকার দুই জনকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন। স্যারের অনুমতি পেয়ে আমাদের গ্রুপের সবাইকে রাস্তায় দাড়া করিয়ে রেখে আমি আর-আমাদের গ্রুপের সহযোদ্ধা দৌলতপুর গ্রামের মোঃ শামসুল হক রাজাকার দুই জন কে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলাম। সর্বশেষ বলে এলাম আপনারা সরাসরি বাড়িতে চলে যাবেন। আর থানায় ফিরে যাবেন না। আর রাজাকারে যাবেন না। দেশ অল্প দিনের মধ্যেই স্বাধীন হবে। বেলকুচি থানা অপারেশন যুদ্ধে আমাদের গ্রুপের সাথে ছিলেন কাজিপুরের জনাব মোঃ আমির হোসেন ভুলু এর দল সহ আরো বেশ কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা দল।

২. কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন সন্নিকটে এ্যাম্বুস :

কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন ও জামতৈল রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশনের কাছে আমরা এ্যাম্বুস করেছিলাম। কালিয়া হরিপুর সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার একটি রেলওয়ে স্টেশন। এই এ্যাম্বুসের নেতৃত্বে ছিলেন গ্রুপ কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান। ৪ নভেম্বর ৭১ গ্রুপের ঝাঞ্ঝা গ্রামের সিরাজগঞ্জের এম.এন, এ জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন তালুকদারের ভায়রা আওয়ামীলীগ নেতা জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ তালুকদারের রেকির ভিত্তিতে কালিয়া হরিপুর রেলওয়ে স্টেশন ও জামতৈল স্টেশনের মাঝ পথে আমরা এ্যাম্বুস করেছিলাম। এই রাতের পাশওয়ার্ড ছিল ১. জবা ও ২. পলাশ। কমান্ডার স্যার-নির্দেশ দিলেন পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কারণ বশত ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লে সবাই একত্রিত হবো। আমার তামাই গ্রামের বাড়িতে। কমান্ডার স্যার ক্রোলিং করে রেল লাইনে বৈদ্যুতিক মাইন বসিয়ে এসে ছিলেন। গ্রুপ কমান্ডার স্যার ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে ছিলেন। আমরা সবাই ধানক্ষেতের মধ্যে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। কমান্ডার স্যারের হাতে মাইনের তার ও ব্যাটারী। টর্চ লাইট ও হ্যারিকেন হাতে রেল লাইনে পাকি মিলি শিয়া ও রাজাকারেরা টহল দিচ্ছিল। ওদের পায়ে লেগে হঠাৎ আমাদের মাইনের তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ছিল। মাইনটি পাকি হানাদারদের নজরে পড়ে ছিল। পাকি হানাদাররা হুইসেল দিয়ে রাজাকারদের লাইং পজিশনে রেডি থাকতে কমান্ড করলো। আমাদের দিকে টর্চ লাইট মেরে মেরে উর্দূতে বকাবকি করতে থাকলো। ইতিমধ্যে ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জ গামী পাকি হানাদার বাহী একটি ট্রেন এলো। পাকি হানাদারেরা সিগন্যাল দিয়ে স্টেশনে ট্রেনটি থামিয়ে দিল। ট্রেনের পাকি হানাদারেরা অস্ত্র তাক করা অবস্থায় নেমে আমাদের কে খুঁজতে থাকলো। আমাদের মাইনটি ব্রাষ্ট করা সম্ভব হলো না। পাকি হানাদারদের সংখ্যাধিক্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে কমান্ডার স্যার উইথড্র হওয়ার কমান্ড করলেন। আমরা ক্রোলিং করে কিছু দূর পিছিয়ে এসে তামাই গ্রামে চলে এসে ছিলাম। পরের দিন সিরাজগঞ্জ থেকে পাকি হানাদার ও রাজাকারেরা এসে কালিয়া হরিপুরের আশেপাশে বিভিন্ন গ্রামের অনেক বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং গ্রামের অনেককে ধরে নির্যাতন করেছিল। আমরা এ্যাম্বুস থেকে ফিরে এসে তামাই গ্রামে কমান্ডার স্যারের বাড়িতে একত্রিত হই। কমান্ডার স্যারের মা আমাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আমরা কমান্ডার স্যারের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের সবাইকে বসিয়ে কমান্ডার স্যার ব্রিফ করলেন। স্থানীয় ভাবে ট্রেনিং দেওয়া বেশ কিছু যুবককে আমাদের গ্রুপে ভর্তি করা হয়েছিল। এত বড় প্লাটুন এক শেল্টারে শেল্টার নেওয়া সমস্যা। তাই কমান্ডার স্যার ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্রনাথ বাগ্‌চী কে কমান্ডার করে আমাদের কয়েক জনের আর একটি গ্রুপ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কমান্ডার স্যার নির্দেশ দিয়ে বললেন- আজ থেকে আমাদের গ্রুপের ডেপুটি কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চী কে আমার দ্বিতীয় গ্রুপের গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে মনোনীত করা হলো। দ্বিতীয় গ্রুপের মুক্তিযোদ্ধা গণ আমার অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চীর কমান্ডাধীন হয়ে কাজ

করবেন। রবীন্দ্রনাথ বাগ্‌চীর গ্রুপের সদস্যরা হলেন শাহজাদপুর থানার অধিবাসী মুক্তিযোদ্ধা ১. মো: বজলুল করিম দুলাল। ২. নজরুল ইসলাম ৩. রতন কুমার দাস ৪. দেবেশ চন্দ্র সান্যাল ও অন্যান্যরা এবং চৌহালী থানার মো: নজরুল ইসলাম। আপনারা আমাদের মূল গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করে অবস্থান নিয়ে নিয়ে আমাদের মূল গ্রুপের কাছাকাছি থাকবেন। প্রয়োজনের সময়ে আমরা দুই গ্রুপ একত্রিত হয়ে পাকিস্তানি সৈন্য ক্যাম্প, রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ ও থানা অপারেশন করবো। সিদ্ধান্ত নিয়ে এক যোগে হেঁটে হেঁটে আমরা এলাম কল্যাণপুর নামক গ্রামে।

৩. কল্যাণপুর যুদ্ধ:

কল্যাণপুর সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান। বেলকুচি থানার কল্যাণপুর নামক গ্রামে একটি স্কুলে আশ্রয় নিলাম। ৫ নভেম্বর ৭১ গ্রামের কয়েক জন নেতৃস্থানীয় মানুষ আমাদের সকালের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা সারারাত নিদ্রাহীন থেকে ও হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালের খাবার খেয়ে কমান্ডার স্যারের কমান্ডে আমরা প্রকাশ্যে পিটি, প্যারেড করলাম। অস্ত্র পরীক্ষার করলাম। অস্ত্রে ফুলথু মারলাম। কমান্ডার স্যারের কমান্ডে আমরা দুইজন করে করে ডিউটি করতে থাকলাম। অন্যান্যরা ঘুম বা বিশ্রামে থাকলাম। কল্যাণপুর একটি নিভৃত গ্রাম। আমাদের ধারণা ছিল এই গ্রামে পাকি হানাদার ও রাজাকার আসবে না। বেলা ১০টার দিকে সেন্দ্রিরত সহযোদ্ধা রতনকুমার দাস দৌড়ে এসে জানালেন আমাদের কে ধরার জন্য বেলকুচি থানা থেকে কয়েকজন পাকি হানাদার মিলে শিয়া ও রাজাকার আসছে। বগড়া গ্রামের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুরের দিকে আসতে ছিল। দুইজন পাকিস্তানি দালাল গামছা দিয়ে মুখ বেঁধে নিয়ে হানাদার ও রাজাকারদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আস ছিল। দূর থেকে অনুমান হলো এই দলে ৫ জন পাকিস্তানি মিলেশিয়া ও ৮ জন রাজাকার আছে। আমাদের কমান্ডার স্যার যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা কমান্ডার জনাব এম.এ মান্নান স্যারের নির্দেশ মত। কল্যাণপুর রাস্তার ধারে বাংকারের মত বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে পজিশন নিলাম। বাঁশ ঝাড়ের সামনে দিয়ে চলা রাস্তা ধরে পাকিস্তানি মিলেশিয়া, রাজাকারেরা এবং পথ চিনানো লোক দুইজন আসছিল। আমাদের রেঞ্জের মধ্যে আসার সাথে সাথে কমান্ডার স্যার কমান্ড ও ফায়ার ওপেন করলেন। এক লাফে হানাদারেরা রাস্তার উত্তর পার্শ্বে পজিশন নিল। ওরাও আমাদের কে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে ছিল। আমরাও একযোগে বৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে থাকলাম। জীবন মরণ ভয়াবহ যুদ্ধ। গোলাগুলির শব্দ পেয়ে আশে পাশের গ্রাম সমূহে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এসে ছিলেন। এক ঘণ্টার অধিক সময় ভয়াবহ সম্মুখ যুদ্ধ চলছিল। তারপর পাকি হানাদারেরা পিছিয়ে গিয়ে ছিল। যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমরা বিজয় উল্লাস করে ছিলাম। সাহায্যকারী বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা দলের সাথে পরিচয় হলো। দেখা গেল জনাব মো: নজরুল ইসলাম ও মো: বাবর আলীর মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ সহ কয়েকটি গ্রুপ আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এসেছে। সকল স্তরের মানুষের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। বিকাল ৩.০০ টার দিকে এক ব্যক্তি দৌড়ে হাপাতে হাপাতে আমাদের কমান্ডার স্যারের কাছে এসে বললেন-“বেলকুচি থানা ও অন্যান্য যায়গা থেকে বেশ কিছু হানাদার সৈন্য ও রাজাকারেরা ভারী অস্ত্র নিয়ে আপনারদের কে আক্রমণ করার জন্য আসছে। সংবাদটি পেয়ে কমান্ডার স্যার সবাই কে নিরাপদ স্থানে সড়ে পরার নির্দেশ দিলেন। কমান্ডার স্যারের নির্দেশে রবীন্দ্র নাথ বাগ্‌চীর কমান্ডানাধীন হয়ে আমরা কয়েক জন হেঁটে পিড়ার চর, খাসিয়ার চর, ও অন্যান্য গ্রাম ঘুরে দৌলতপুর গ্রামের সহযোদ্ধা মোঃ শামসুল হকের বাড়িতে শেল্টার নিয়ে ছিলাম। পর দিন বেতকান্দি মিস্ত্রীবাড়ির ফাঁকা ভিটায় এসে কিছু সময় বিশ্রাম নিলাম। মো: কোরপ আলী মোল্লা নামক এক জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের সকালের খাবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা ওখানে খাওয়া-দাওয়া করলাম। তিনি তার বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমাদের কমান্ডার রাজি

হলেন না। আমরা ফরিদ পাঙ্গাসী গ্রামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আলহাজ্ব মো: আবু তালেব মাষ্টারের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। কয়েক দিন দৌলতপুর, তেঞাশিয়া, খুকনী, বাজিয়ারপাড়া, দরগার চর ও অন্যান্য গ্রামে শেল্টার নিয়ে থাকলাম। প্রতিদিন রাতে কমান্ডার স্যার আমাদের পাসওয়ার্ড দিতেন। প্রতিদিন সকালে অস্ত্রে ফুল থু মারা হতো ও তেল দেওয়া হতো। প্রতিদিন পাকিস্তানি সৈন্য ক্যাম্প ও রাজাকার ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য গ্রুপ করে করে রেকি করতাম।

৪. ধীতপুর যুদ্ধ:

ধীতপুর সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম। এই যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন ডেপুটি কমান্ডার (কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত) বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচী। ১২ ডিসেম্বর '৭১ রাতে আমাদের শেল্টার ছিল সৈয়দপুর গ্রামের কালা চক্রবর্তী, আখর হাজী ও অন্যান্যের বাড়িতে। ১৩ ডিসেম্বর '৭১ বেলা ১২.০০ টার দিকে সংবাদ পেলাম পাকি হানাদারেরা কৈজুরী হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। টাঙ্গাইলের যুদ্ধে পাকি হানাদারেরা পরাজিত হয়ে লঞ্চে যমুনা নদী পাড় হয়ে মালিপাড়া রাজাকার ক্যাম্পে এসে ছিল। মালিপাড়া ক্যাম্প থেকে রাস্তা চিনানোর জন্য দুই জন রাজাকারকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াপদা বাঁধ ধরে বেড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কৈজুরী থেকে আমরা পাকিস্তানি সৈন্যদের পিছু নিলাম। আমরা পাকি হানাদারদের অনুসরণ করছিলাম। আমাদের কমান্ডারের নির্দেশ ছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের লোকজনদের আর ক্ষতি না করলে আমরা ওদেরকে কিছু বলব না। ওরা ক্ষুধার্ত। কৈজুরী গ্রামের একজনের মুলা ক্ষেত থেকে মুলা খাওয়ার চেষ্টা করলো। ওরা হয়তো জানতো না কাঁচা মুলা খাওয়া যায় না। ওয়াপদা বাঁধ ধরে ওরা অগ্রসর হতে লাগলো। আমরাও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওদের পিছু পিছু যাচ্ছিলাম। ওরা ভীষণ ক্রোধী। ধীতপুর নামক স্থানে গিয়ে ওরা আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করে ছিল। আমরা জাম্প করে ওয়াপদা বাঁধের পশ্চিম দিকে পজিশন নিয়ে ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারেরা ওয়াপদা বাঁধের পূর্ব পার্শ্বে পজিশন নিয়ে ছিল। এক ঘণ্টার অধিক সময় ব্যাপি গুলি পাল্টা গুলি চলতে থাকলো। গুলির শব্দে শাহজাদপুর, বেলকুচি, চৌহালী ও বেড়া থানার বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা দল আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে এলো। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। হানাদারেরা গুলি করা বন্ধ করলো। আমরাও অন্ধকারে গুলি করা বন্ধ করে দিয়ে ছিলাম। সারারাত আমরা না খেয়ে পজিশন অবস্থায় ছিলাম। আমাদের গ্রুপটি ছিল বাবু রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কমান্ডানাধীন। এই যুদ্ধে আমি ত্রি নট ত্রি রাইফেল চালিয়েছি। আমার বাম পার্শ্বে অবস্থান ছিল আমার কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগচীর। তিনি এলএমজি চালাচ্ছিলেন। আমার ডান পার্শ্বে অবস্থান পজিশন নিয়ে অস্ত্র চালাচ্ছিলেন কাদাই বাদলা গ্রামের মো: নজরুল ইসলাম, পুকুর পার গ্রামের রতন কুমার দাস ও অন্যান্যরা। আমাদের গ্রুপের ডান পার্শ্বে অবস্থান ছিল বেড়া থানার এস এম আমির হোসেন এর গ্রুপ ও অন্যান্য গ্রুপ। সারা রাত দুই জন রাজাকার মাঝে মধ্যে কাভারিং ফায়ার করছিল। আমরাও ওদের ফায়ারের জবাবে দুই একটি করে ফায়ার করছিলাম। ভোরের দিকে আমাদের কমান্ডার ও অন্যান্যরা রাজাকার দুই জন কে ঘিরে ধরে আত্মসমর্পণ করিয়ে ছিল। রাজাকার দুই জন কে আত্মসমর্পণ করানোর পর জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল রাত ১২.০০ টার পর পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদেরকে কাভারিং ফায়ার চালানোর নির্দেশ দিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা বেড়ার দিকে পালিয়ে গেছে। পরে জানা গেল। ঐ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা বেড়া নদীতে থাকা ভেড়া কোলা গ্রামের হলদারদের নৌকায় বেড়া

নদী পাড় হয়ে নগর বাড়ি হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেছে। এই ভয়াবহ যুদ্ধে আমাদের পক্ষের দুই জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। ঐ দিন স্থানীয় দুজন পথচারী গোলাগুলির সময়ে গুলি লেগে মারা গিয়ে ওয়াপদা বাঁধের উপর পরে ছিলেন। আমাদের ও অন্যান্য গ্রুপের বেশ কয়েক জন আহত হয়ে ছিলেন। দীতপুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে আমরা জামিরতা হাই স্কুলে ক্যাম্প করে অবস্থান নিয়ে ছিলাম। ঐ দিনই শাহজাদপুর ও অন্যান্য স্থানের মুক্তিযোদ্ধারা শাহজাদপুর ও বাঘাবাড়ী ঘাট থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিতারিত করেছিলেন। ১৪ ডিসেম্বর '৭১ শাহজাদপুর থানা হানাদারমুক্ত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ একা নব্বই হাজারাধিক পাকিস্তানি সৈন্যের পক্ষে অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে) বাংলাদেশে অবস্থান রত সকল পাকিস্তানি সৈন্যের পক্ষে আমাদের যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৭ ডিসেম্বর ভারতীয় একঝাঁক বিমান আমাদের জামিরতা ক্যাম্পের উপর দিয়ে গিয়ে সারা দেশ ঘুরে যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ দেখলেন। আমাদের মহান মুক্তি যুদ্ধের বিজয় অর্জন হয়। শাহজাদপুর থানায় মুক্তিযোদ্ধা প্রশাসন গড়ে উঠে। মো: আব্দুল বাকি মির্জা খোকন শাহজাদপুর থানার মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক ও থানা প্রশাসক মনোনীত হন। তিনি সিও (ডেভ) অফিসে বসতেন। শাহজাদপুর থেকে সারা থানার মুক্তিযোদ্ধাদের সমস্ত খরচ বহন করতেন। ১৮ ডিসেম্বর '৭১ আমাদের ক্যাম্প কমান্ডার রবীন্দ্র নাথ বাগচীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে আমার বাবা-মায়ের খোঁজে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। উল্লাপাড়া স্টেশন থেকে ট্রেন যোগে চাপাই নবাবগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছালাম। তারপর মহানন্দা নদী পার হয়ে বাস যোগে মালদহ শহরে পৌঁছালাম। ওখান থেকে মালদহ রেলওয়ে স্টেশনে গেলাম। তখন রাত প্রায় ১০টা। স্টেশনে গিয়ে জানতে পারলাম ভোরের আগে ওল্ড মালদহ যাওয়ার কোন ট্রেন নাই। সে রাতটি ছিল ভিষন শীতের রাত। আমার পকেটে তেমন টাকা ছিল না। হোটেল/বোডিং থাকা অথবা রিজার্ভ যানবাহন নিয়ে ওল্ড মালদহ যাওয়ার মত টাকা ছিল না। বাধ্য হয়ে আমার একটি পাজামার উপর স্টেশনে শুয়ে খালি গায়ে রাত কাটালাম। ভোরের ট্রেনে ওল্ড মালদহ গেলাম। ওল্ড মালদহ পিশিমার বাড়িতে পৌঁছে জানতে পারলাম। আমার বাবা-মা ও অন্যান্যরা আমার ছোট দাদু মনীন্দ্র নাথ সান্যাল এর বাড়ি জলপাই গুড়িতে গিয়াছেন। আমার বড় দাদা আমার খোঁজে বাংলাদেশে এসেছেন। ১৬ ডিসেম্বর '৭১ এর পর কয়েক দিন রাস্তা ঘাটে চলাচল ছিল ঝুঁকি পূর্ণ। বাস লাইনে ও অন্যান্য যায়গা মাইন বা বোম ব্রাষ্ট হতো। অনেকের ধারণা ছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা পালানোর পূর্বে রাস্তা ঘাটে মাইন, বোম বা অন্য কোণ আন্নেয় অস্ত্র মাটিতে পুতে রেখে গেছে যাতে বাস চলাচলে ব্রাষ্ট হয়ে বাঙালিরা মারা যায়। রাস্তা ঘাট অত ঝুঁকি পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ১৮ ডিসেম্বর '৭১ আমার বড়দাদা আমার খোঁজে বাংলাদেশে এসে ছিলেন। আমাদের বড় বৌদি আমাদের মাতৃবৎ। বড় বৌদিরা যে মায়ের মত হয় এটা আমাদের বড় বৌদি একটি প্রমান। তখনকার সময়ে পুত্রবধু গণ শ্বশুর শাশুড়ী মাতার কথার অবাধ্য হতেন না। আমাদের বড় বৌদি এত ঝুঁকির মধ্যেও আমার বড় দাদাকে আমার খোঁজে পাঠাতে সম্মত হয়েছিলেন। কোন প্রকার আপত্তি করে ছিলেন না। তখন আমাদের দেশে মোবাইল ছিল না। আমার পিশি মাকে বুঝিয়ে আমার বাবা মাকে বাংলাদেশে চলে আসার কথা বলে পর দিনই আবার বাংলাদেশে চলে এলাম। ১৯ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ও সেনা বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খান এর কাছ থেকে ক্ষমতা নেয় পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয়ী পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুল ফিকর আলী ভুট্টো। তিনি

প্রেসিডেন্ট হিসাবে ৮ জানুয়ারী'৭২ আমাদের জাতির পিতাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেন। জাতির পিতা ঐ দিনই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সকালে বিমানে যাত্রা করে বিকালে অবরতরণ করেন ইংল্যান্ডের হিব্রো বিমান বন্দরে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বাঙালিদের জাতির পিতাকে বিশেষ সম্মান দেখিয়ে সংবর্ধনা দেন। জাতির পিতা ১০ জানুয়ারী ব্রিটিশের বিশেষ বিমান যোগে বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাংলাদেশে আসার পথে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রণে ভারতে যাত্রা বিরতি করেন। ১১ জানুয়ারী'৭২ জাতির পিতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসাবে অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশ জারি করলেন। ১২ জানুয়ারী নতুন সরকার দেশের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। প্রধান মন্ত্রী হিসেবে জাতির পিতা আমাদেরকে অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমাদের গ্রুপ ২৪ জানুয়ারী'৭২ রবিবার সিরাজগঞ্জ সদরস্থ ইব্রাহিম বিহারীর বাসায় অস্থায়ী অস্ত্র জমা নেওয়ার ক্যাম্পে হাতকাটা আর্মি অফিসার জনাব মো: সাইফুল্লাহ এর সম্মুখে অস্ত্র ও গোলা বারুদ জমা দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের দায়িত্ব শেষ করলাম। অস্ত্র জমা দেওয়ার রশিদ নিয়ে খালি হাতে বাড়িতে চলে এলাম। সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের পুণর্বাসন ও কর্মসংস্থানের জন্য ন্যাশনাল মিলেশিয়া ক্যাম্প করা হলো। আমি ন্যাশনাল মিলিশিয়া ক্যাম্পে ভর্তি হলাম না। ভারতের শরণার্থী ক্যাম্প থেকে আমাদের বাবা মা ও পরিবারের সবাই স্বাধীন দেশে ফিরে এলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী'৭২ সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বকেয়া রেশনিং ও পকেট এ্যালাউন্স হিসাবে ১১০/- টাকা, জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনী ও সমানী ও আঞ্চলিক অধিনায়ক ৭ নম্বর সাব সেক্টর মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ এর সিল মারা স্বাক্ষরিত দেশ রক্ষা বিভাগ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদ পত্র নম্বর - ১২৯১৫৮ ও একটি সাদা কম্বল দিলেন। উক্ত সনদ পত্রে মুক্তিযোদ্ধার স্বাক্ষরের যায়গা ছিল। কয়েক দিন পর রতন কান্দি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার বড় দাদা দেবেন্দ্র নাথ সান্যাল এম.কম এম.এড এর কাছ থেকে অষ্টম শ্রেণীর অটোপাশের টিসি নিয়ে শাহজাদপুর বহুপার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে লেখা পড়া শুরু করলাম। পরিবারে ফিরে এসে বসবাসকালীন বিভিন্ন সময়ে পিতৃদেব, মাতৃদেবী ও পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে সংসারে আমার অনুপস্থিত কালীন সময়ের বিভিন্ন কথা জানতে পারলাম। জানতে পারলাম- অনেক কষ্ট করে ঝুঁকি নিয়ে আমার গোটা পরিবার ভারতে গিয়ে ছিলেন। ভারতে গিয়ে প্রথমে আসামের মানিকারচর শরণার্থী ক্যাম্পে ভর্তি হয়ে ছিলেন। শরণার্থী ক্যাম্পে থাকা ও খাওয়া দাওয়া অনেক কষ্ট কর। অধিকাংশ মানুষের খোশ পাচড়া কলেরা ও অন্যান্য রোগ হচ্ছিল। কলেরায় আমাদের গ্রামের সুশান্ত ঘোষ মারা গিয়েছে। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ থাকার জন্য যে তাবু বরাদ্দ দিয়েছিল ইহাতে স্থান সংকুলান হয় না। বাধ্য হয়ে মানিকার চর গ্রামের বিদ্যারতন সাহা'র বাড়ির দুইটি ঘর ভাড়া নেওয়া হলো। মা প্রায় সময়ই কান্নাকাটি করতেন। বিদ্যারতন সাহা'র বাড়িতে মন্দির ছিল। ঐ বাড়ির এক বৃদ্ধা বললেন- আমার মন্দিরের শ্রী বিগ্রহ এর কাছে শুনে দিতে পারবো। আপনার ছেলে কেমন আছে। আমার মাতৃদেবী তাঁর কথায় শান্তি পেলেন। পরের দিন স্নানাদি করে সেই বৃদ্ধা মহিলার সাথে মন্দিরে গিয়ে শ্রী বিগ্রহ সমীপে প্রার্থনা জানালেন। মন্দিরের চার দিক থেকে টিক টিকি ডেকে উঠলো। বৃদ্ধা মহিলা আমার মাতৃ দেবীকে বললেন-ভগবান বলছেন আপনার ছেলে ভালো আছে। বড় দাদা শরণার্থী ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে কলকাতা

গেলেন। কলকাতা থেকে আমাদের পরিবার কে ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আত্মীয় বাড়িতে যাওয়ার পারমিশন বের করে আনলেন। তারপর পিতৃদেব ও মাতৃদেবী সহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে কলকাতা গেলেন। আমাদের দুই মামা অশোক চক্রবর্তী ও অলোক চক্রবর্তী সহ অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। কলিকাতার কালী ঘাটে গেলেন। আমার জন্য কালী ঘাটের মা কালীর কাছে মানুষ্য করলেন। ওখানে হনুমান আছে। এক হনুমান কে তার বাচ্চা সোহাগ করা দেখে আমার মাতৃদেবী আমার জন্য অনেক কঁদে ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বাড়িতে এসে জানতে পারলাম। আমার কারণে আমার বড় দাদা ও ছোট ভাই নৌকা ডুবিতে মরতে নিয়ে ছিল। আমি ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আধা ঘণ্টা পরই মাতৃদেবী আমাকে খেতে ডেকে ছিলেন। আমাকে না পেয়ে খোঁজা খুঁজি করে জানতে পেরে ছিলেন পালেদের বিলের ঘাট থেকে এক নৌকা মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিয়ার জন্য ভারতে রওনা হয়েছে। মাতৃদেবী আমার জন্য কান্নাকাটি শুরু করেছিলেন। তখন আমার বড় দাদা ও ছোট ভাই গ্রামের মোঃ বজলু পাল সহ কয়েক জন কে একটা নৌকা নিয়ে আমাকে ফিরিয়ে আনতে শাহজাদপুরে এম.পি.এ সাহেবের বাড়িতে গিয়ে ছিলেন। ওখানে আমাকে পান নাই। ফিরে আসার সময় শাহজাদপুর করতোয়া নদীতে নৌকাটি ডুবে যায়। আমার ভাই ছোট হওয়ায় সবাই তাকে ধরে বাঁচাতে যায়। তখন আমার ভাই বলে - “আমি সাঁতার জানি, আমার বড় দাদা সাঁতার জানেনা। আমার বড় দাদাকে বাঁচান।” সবাই নৌকাটি উলটিয়ে সাঁতারিয়ে আমার বড় দাদা ও ছোট ভাই কে বাঁচিয়ে ছিল। আমাদের ছোট ভাই সৌমেন্দ্র নাথ সান্যাল ছিল ভগবান শ্রী শ্রী রাম চন্দ্রের ভাই শ্রী লক্ষ্মণের মত ভাতৃভক্ত। সে নিজের বাঁচা মরার কথা চিন্তা না করে সকলকে বড় দাদা কে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করেছিল। ২০ জানুয়ারী আমাদের বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্যরা বাড়িতে এলেন। বড় দাদা পূর্ব থেকেই বাড়িতে এসেছিলেন। গ্রামের মোঃ হোসেন আলী আনন্দ চিন্তে বাড়ি ফেরার জন্য দেওয়া টাকা ফেরৎ না পেয়েও বাড়ি সহ বাড়ির সব কিছু ফেরৎ দিলেন। বড় দাদা জামিরতা ক্যাম্প গিয়ে আমাকে নিয়ে এসে ছিলেন। আমাকে কাছে পেয়ে বাবা-মা সহ পরিবারের সবাই আনন্দে আবেগ প্রবণ করে পড়লেন। মাতৃদেবী আমাকে জড়িয়ে ধরে কিছু সময় আনন্দ অশ্রু ফেললেন। মাতৃদেবী প্রথমে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না। মাতৃদেবী আমাকে বললেন- বাবা তোর জন্য আমাদের কালী বাড়িতে মানুষ্য করা আছে। আগে তোর হাত দিয়ে শ্রী শ্রী কালী মাতার মন্দিরে হরিলুট দেওয়াবো, তারপর বাড়িতে আনবো। আমি বাড়ির সামনে কিছু সময় দাড়িয়ে থাকলাম। আমার ছোট ভাই শমেন ও বোন দুলালী বাবা মায়ের নির্দেশে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে হরিলুট দেওয়ার জন্য বাতাসা কিনে নিয়ে এলো। তারপর আমার মাতৃদেবী আমাকে নিয়ে শ্রী শ্রী কালী বাড়িতে গেলেন। আমার হাত দিয়ে হরিলুট দেওয়ালেন। তারপর আনন্দ করে সবাই আমাকে বাড়িতে নিয়ে এলো। আমাদের পরিবার ভারত থেকে যে দিন বাড়িতে এসে ছিল। প্রতিবেশী মোঃ বজলু পাল আমাদের পরিবারের সকলের খাবার জন্য চাউল, ডাল ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ দিন রাতে মোঃ বজলু পালের দেওয়া চাউল, ডাল ও অন্যান্য দিয়ে আমাদের পরিবার রাতের খাবার খেয়ে ছিলেন। পর দিন বাবা মা ও অন্যান্যদের প্রণাম করে আবার জামিরতা ক্যাম্প ফিরে গেলাম। কারণ আমার নামে অস্ত্র ও অন্যান্য ইস্যু করা আছে। এই সকল অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরকারের কাছে জমা না দেওয়া পর্যন্ত আমার দায়িত্ব শেষ হবে না। পিতৃদেবের কাছে

শুনলাম-২০ জানুয়ারী'৭২ রাত ১১.০০ টার দিকে পরিবারে সবাই বাড়িতে এসে পৌঁছে ছিলেন। মানিকার চর শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান কালীন সময়ে এক রাতে আমার মেজদা সমরেন্দ্র নাথ সান্যাল একটি দুঃস্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে দেখলেন আমি মেজদার কাছে রুটি খেতে চাচ্ছি। স্বপ্ন দেখে মেজদা ঘুমের ঘরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। মেজদার কান্নায় আমার মাতৃদেবী সহ সকলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাতৃদেবী মেজদার কাছে গিয়ে বললেন-কী হয়েছে মেজদা বললেন ভাই দেবেশ এসে ছিল। ভাই আমার কাছে রুটি খেতে চাইলো। আমি ভাইকে বললাম- ভাই তোর জন্য বাবা মা পাগল হয়ে গেছে। তুই থাক। মেজদার কাছ থেকে স্বপ্নের কথা শুনে আমার মাতৃদেবীও হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন- তা হলে দেবেশ হয়তো মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছে। দেবেশের অশরী আত্মা রুটি খেতে এসেছিল। আমার বড় বৌদি শ্রীমতী রেখা রাণী সান্যাল একদিন মানিকার চর শরণার্থী ক্যাম্পে অবস্থান কালীন সময়ের একটি ঘটনা কথা বললেন- ঘটনাটি হলো- আমার পিতৃদেব ধূমপান করতেন। এক দিন বৌদি দেখলেন- আমাদের পিতৃদেব মন খারাপ করে বসে আছেন। বৌদি ভাবলেন এক দেবেশের চিন্তা, দুই দেশের আপন জনদের ছেড়ে আসা, ও এখানে অর্থ কষ্ট। টাকা-পয়সা উপার্জনের কোন উপায় নাই। টাকা পয়সার অভাব। বৌদির কাছে তাঁর কিছু হাতের কাজ শ্রী শ্রী গোপাল বিহ্নের ছবি তোলা কাপড়, বসার আসন ও অন্যান্য ছিল। বৌদি শরণার্থী ক্যাম্পে ঐ হাতের কাজগুলো বিক্রি করে পাওয়া সব টাকা গুলো বাবা কে দিলেন। বৌদি ভাবলেন- শ্বশুর মহাশয়ের অন্তত হাত খরচের টাকার যেন অভাব না হয়। আমার ছোট ভাই সৌমেন্দ্র নাথ সান্যাল (শমেন) একদিন বললো-তুই মুক্তিযুদ্ধে যাবার পর তোর জন্য আমি অনেক কেঁদেছি। বড় দাদার স্কুল বন্ধ থাকার কারণে বাঘাবাড়ি থেকে কেরোসিন তেল কিনে নিয়ে আলম কাকার সাথে নিয়ে এনায়েতপুর গিয়ে কেরোসিন তেল বিক্রি করতেন। ডোংগা নিয়ে যেতাম। এনায়েত পুরের নিকটে এক ঘাটে আমাকে ডোংগায় বসিয়ে রেখে বড়দাদা ও আলম কাকা কেরোসিন তেল বিক্রি করে আসতেন। আমি ডোংগায় একাকী বসে থাকতাম আর কাঁদতাম। ভাবতাম দেবেশ দা থাকলে আমাকে এই দায়িত্ব পালন করতে হতো না। এ দায়িত্ব দেবেশ দা পালন করতো অথবা আমরা দুই ভাই পালন করতাম। একদিন মেজদা সমরেন্দ্র নাথ সান্যাল বললেন আমরা যে দিন বাড়ি থেকে নৌকা পথে ভারতের উদ্দেশ্য যাত্রা করি পালেদের বিলের মধ্যে গ্রামের মো: কোরবান আলী সরকার আমাদের নৌকা ঠেকিয়ে দিয়ে ছিলেন। মো: কোরবান আলী সরকার ছিলেন রতন কান্দি আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য। তিনি বড় দাদাকে বললেন- আপনি স্কুলের হিসাব নিকাশ দিয়ে যান। তিনি বললেন- আপনি স্কুলের হিসাব নিকাশ না দিয়ে যেতে পারবেন না। পালেদের বিলের মধ্যে এই অবস্থা দেখে পার্শ্ববর্তী মো: আকবর আলী প্রামানিক ও অন্যান্যরা এগিয়ে এলেন। মো: আকবর আলী প্রামানিক বললেন- “ওনাদের যেতে দিন”। দেশ স্বাধীন হলে দেশে ফিরে এসে সব হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিবেন। মো: আকবর আলী প্রামানিক এর কথায় সবাই সায় দিলেন। মো: কোরবান আলী সরকার আমাদের নৌকা ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। তারপর নৌকা নিয়ে আমরা বেলকুচি থানার বালাবাড়ী গ্রামের পর ধুকুরিয়া বেড়ার কাছাকাছি গিয়ে নামলাম। তারপর হাঁটপথে আমরা বড় মাঐ মহাশয়ের বাড়ি বেলকুচি থানার মুকুন্দ গাতী গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ধুকুরিয়া বেড়া বাজার অতিক্রম করার পর কয়েক জন যুবক এসে আমাদের সাইকেল কেড়ে নিল। পরে ঐ গ্রামের কিছু ভালো

লোকের সহযোগিতায় সাইকেল টি ফেরৎ পাওয়া গিয়ে ছিল। ভারতে যাওয়া ছিল অত্যন্ত ঝুঁকি পূর্ণ। যে দালাল আমাদের কে ভারতে নিয়ে যাবে। কিছু দিন তিনি সাহস পাচ্ছিলেন না। আমরা কয়েকদিন বানিয়া গাঁতী গ্রামে এক বাড়ির দুইটি ঘর ভাড়া নিয়ে ছিলাম। তারপর দালালের পরামর্শ ও গাইডে সিরাজগঞ্জের পোড়া বাড়ি ঘাট হতে নৌকা ভাড়া নিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে নৌকা পথে ভারতের মানিকারচর ঘাটে গিয়ে পৌঁছে ছিলাম।□

মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি : দেবেশ চন্দ্র সান্যাল, পিতা: দ্বিজেন্দ্র নাথ সান্যাল,মাতা: নিলীমা সান্যাল, গ্রাম ও ডাকঘর : রতন কান্দি, ইউনিয়ন : হাবিবুল্লাহনগর, উপজেলা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ। গেজেট নং-বে-সামরিক সিরাজগঞ্জ-১৬৭৯। ভারতীয় প্রশিক্ষণ - এফ.এফ. নং-৪৭৪২। সমন্বিত তালিকা জেলা ভিত্তিক -১৪১১, উপজেলাভিত্তিক-১৫৮ মুক্তিযোদ্ধা পরিচিতি - ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, ডিজিটাল সনদ ও পরিচয় পত্র নং- ০১৮৮০০০১৪১১।